সন্দীপনা

ই ষ্ট বা র্তা বা হী সা হি ত্য - মা সি ক

৪৩বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, ডিসেম্বর'১৬-জানুয়ারি'১৭ খ্রিঃ, শ্রীঅনুকূলাব্দ ১২৯

অবস্থা বা ব্যাপারের সম্মুখীন হ'লে
চিন্তায় অনেক কথাই মনে আসে,
কিন্তু যে-কথা তদ্‌ব্যাপারে হিতপ্রদ—
তোমার পক্ষে ও ব্যাপারের দিক্ দিয়ে,—
তা'ই সাধারণতঃ হিতী-বাক্,
নয়তো, উত্তেজনার আবেগ-উচ্ছ্বাসে
তোমার প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জিত ভাব বা ধারণা
যা' অহিত-সন্দীপী,
ও তোমার বা তোমার উদ্দেশ্যানুস্যূত বিষয়ের পক্ষে
প্রতিকূল,—
তা'র অভিব্যক্তি দেওয়াই
বিকৃতি ও বেকুবী ছাড়া কিছুই নয়;
আবার, তেমনি তোমার কা'র প্রতি
কখন কী করণীয়,
অবস্থা ও পরিস্থিতি হিসাবে
যা'র প্রতি যখন যেমন ক'রছ
তা' তা'র পক্ষে হিতপ্রদ কিনা
বিচেনা ক'রে দেখো,
নয়তো, অনেক সময় ভাল ক'রতে গিয়েও
মন্দ ফল হয়। (সদ্‌বিধায়না-১৩২)

—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

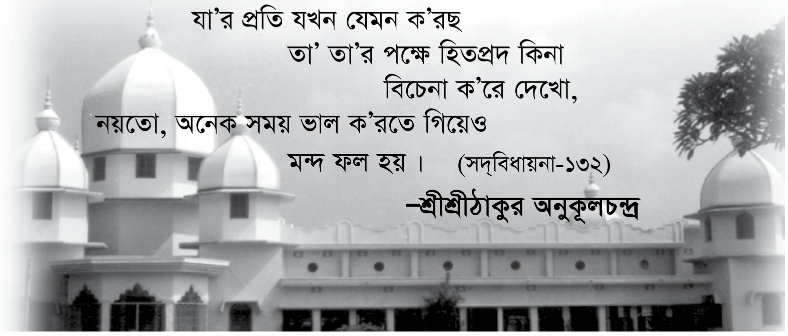

সূচিপত্র

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ৪
দিব্যবাণী ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ৭
মাতৃদীপনা- সেবা-বিধায়না ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ১০
ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ১৩
দেখা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫
আমি তোমাকে ভালোবাসি ঃ জগদীশ দেবনাথ ১৭
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও পুণ্যতীর্থ পাবনা হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রম ঃ ড. প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত ২০
শিশুর জন্ম ও সংস্কার ঃ শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৩
প্রেমল ঠাকুর ঃ প্রলয় মজুমদার ২৬
শ্রীশ্রীঠাকুর ও আধ্যাত্মিকতাঃ শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়........ ২৯
মানসতীর্থ পরিক্রমা ঃ সুশীল চন্দ্র বসু ৩১
চিরঞ্জীব বনৌষধী–হিলমোচিকাঃ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য ৩৭
যে ফুল শোভা না ছড়িয়ে ঝড়েছে ধরণীতে ঃ শ্রীঅনির্বান দেবনাথ........ ৩৯
প্রার্থনার সময়সূচি ৪০

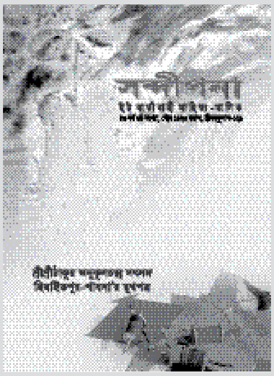

সম্পাদক
ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

নির্বাহী সম্পাদক
শ্রীজগদীশ দেবনাথ

সম্পাদনা সহযোগী
শ্রীতাপসকুমার রায়
tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

ঢাকা কার্যালয়
১৪০/১ শাঁখারী বাজার
ঢাকা-১১০০।

চট্টগ্রাম কার্যালয়
২৭ দেওয়ান্‌জী পুকুর লেন
রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ০৩১-২৮৬০৭১১
মোবাইল: ০১৭১৪-৩১০২০৩
০১৮১৯-৩১২৫১৮

প্রধান কার্যালয়
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ
হিমাইতপুর-পাবনা
ফোনঃ ০৭৩১-৬৫৫২৩, ৬৫১৬৪
মোবাইলঃ ০১৭১৫-৫৩৪২০৭ (সম্পাদক)
০১৯১১-৭৮৮১৩৯ (সম্পাদনা সহযোগী)
০১৭১৮-১৫২৩৪৪ (অফিস)
E-mail: satsanghimaitpur@yahoo.com

বাণিজ্যিক যোগাযোগ
শ্রীঅনিশচন্দ্র ঢালী
০১৭১৯-৭৫৩৪৭৪

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠা সজ্জা
আমিনুল ইসলাম
প্রিন্ট মিডিয়া, প্রেসপট্টি, বগুড়া

অনলাইনে 'সন্দীপনা' পড়তে ভিজিট করুন—
www. srisrithakuranukulchandrasatsang.com/pages/publications

সম্পাদকীয়

"শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই ফুরোল শীতের বনে
এলে যে–
আমার শীতের বনে এলে যে সেই শূন্যক্ষণে ।"

প্রকৃতির সহজ নিয়মে অগ্রহায়ণ পেরিয়ে পৌষ আসে । সাধারণতঃ যে মাসে পুষ্যানক্ষত্রে পূর্ণিমার অস্ত হয় তাকে চান্দ্র-পৌষ বলা হয় । সূর্যের ধনুরাশির স্থিতিকালেই এর সংযোগ । সে জন্যে একে সৌর পৌষও বলে ।

পৌষের আরম্ভের পূর্বদিন ছিল ১৬ ডিসেম্বর । স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের বিজয় দিবস । বিজয় শব্দটির ধাতুগত অর্থ–বি+জি (জয় করা)+অ । মানে বিশিষ্ট রূপে জয় করা । জয় এর সমার্থক শব্দ জিৎ । ভক্ত প্রাণে তাই একান্ত সংকল্প– তিনি যেন 'কাম-লোভ-জিৎ' হ'য়ে উঠতে পারেন । শব্দের বোধ-চেতনা জীবনকে প্রভাবিত করে । জিৎ মানে জয়ী । জিৎ মানে পরাজিত । জিৎ-চেতনাই জীবনের সংগ্রামী প্রেরণা ।

শীত– হতাশার আশ্রয় নয় (প্রেরণার-ফসল) । কবি তাই গেয়েছেন–

এল যে শীতের বেলা বরষ-পরে,
এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে ॥

করো ধরা, করো ধরা, কাজ আছে মাঠ ভরা–
দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে ।

গুরু পুরুষোত্তম বলেছেন–

'সময় কিন্তু রয় না ব'সে
চলছে কেবল অবিরল,
করণীয় যা এক্ষুনি কর,
ভবিষ্যে যদি চাস সুফল ॥'

আমরা সবাই সুফল প্রত্যাশী । সুফল ঘরে ঘরে তুলতে চাই । তার জন্য সাধনা চাই । আত্ম-নিবেদনের আকুতি চাই । প্রাণের ছটফটানি–ত্রস্ততা চাই । কবিগুরু যেন আমাদের সম্মুখে সেই প্রাক-চেতনার প্রেরণা শুনাচ্ছেন– জীবনের সহজ নিয়মে– বাইরের কাজ সারা হলে– নতুন সাধনার মিলন প্রেরণার ডাক সহজ ভাবেই আসবে ।

'বাহিরে কাজের পালা হবেই সারা
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যা তাঁরা–

আসন আপন হাতে পেতে রেখো আঙিনাতে
যে সাথি আসিবে রাতে তাহারি তরে ॥

সেই প্রার্থিত সাথী (সাথি) দিনে আসবেন না । রাতেই আসবেন । তিনি তো প্রাণের দেবতা, নিভৃত প্রাণের দেবতা । অসময়ে নিভৃতে ব্যথার সাথী না ডাকলেও ব্যথা বোঝেন– কাছে আসেন– ব্যথা মোছেন ।

৪ পৌষ মাতা সারদাদেবীর আবির্ভাব তিথি । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরে সঙ্ঘ-জননী মাতা-সারদা প্রেমে, মমতায়, দরদে, সেবায়, রামকৃষ্ণ ভক্ত-সঙ্ঘকে প্রাণবন্ত ক'রে রেজে গেছেন । পুরুষোত্তম-ঘরণীর জীবন-চরিত তাই এক অবিস্মরণীয় অনধ্যেয় জীবনচরিত ।

৯ পৌষ । বড় দিন । বড় হওয়ার দিন । বড়কে হৃদয়ের গভীরে ধারণ করার সাধনায় আত্মনিবেদনের দিন । ভগবান যীশুখৃষ্টের

আবির্ভাব স্মৃতি-দিন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বললেন–

'সবায় বড় করবি যত
ততই বড় হবি তুই,
বড় হওয়ার একটিই তুক্
একটি ছাড়া নাইকো দুই।'

যথার্থ বড় যিনি তাঁকে অনুভব করার সাধনাই জীবন-সাধনা। প্রশ্নশূন্য হয়ে বড়র প্রতি আত্মনিবেদন– তাঁর প্রতি বিশ্বাস, নির্ভরতা আর আত্মত্যাগ এই তিনটি গুণই মানুষকে বীর হয়ে ওঠার প্রেরণা যোগায়। 'বড়' আর 'ছোট' এর মাঝে যে দ্বৈরথ সংগ্রাম তা নিয়েই তো নিরন্তর জীবন-সংকট। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়েছেন–

'বড়র প্রতি শ্রদ্ধানতি
ছোটর প্রতি স্নেহ
যেই হারালি অমনি রে তোর
রইলো না আর কেহ।'

পরম সত্য-সুন্দর যিনি– তিনিই ভগবান। সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য আর জ্ঞান ভাণ্ডারের যোগফলের চেয়েও অনেক বেশী সুফল-বাহী মহিমা তাঁর।

২৫ ডিসেম্বর, ৯ পৌষ-পরম শ্রদ্ধাভাজন ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের জন্মদিন। সনাতনী ধর্ম, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-চেতনার ধারক ব্যক্তিত্ব ড. ব্রহ্মচারীর শ্রীচরণে আভূমি প্রণতি আমার। পাকিস্তানাক্রান্ত পূর্ব-বঙ্গের সর্বত্র তাঁর ধর্ম-প্রচারণার নিরন্তরতা শৈশবেই আমাকে মুগ্ধ বিস্মিত করেছিল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার সর্বত্র তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন। অসংখ্য মন্দির আশ্রম সংরক্ষণ সংস্কারে তাঁর নিরলস কর্মতৎপরতা বিস্ময়কর। ১৯৭১ এর মুক্তি-যুদ্ধের পর বিপন্ন সৎসঙ্গ আশ্রমে অসহায়তার কথা তিনি মনে রেখেছিলেন ১৯৭৫-এর কোনও এক প্রত্যুষে তিনি সরাসরি হিমাইতপুরে এসেছিলেন। অসহায় সৎসঙ্গ-আশ্রমের পরিবেশ মণ্ডলে উপস্থিত হয়ে তিনি আশ্রমবাসী ভক্তবৃন্দকে অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্যের জন্ম-শতবর্ষের স্মৃতি-পরিক্রমায় ড. ব্রহ্মচারী স-পরিষদ হিমাইতপুর আশ্রমে বিশেষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেছিলে। তাঁর স্মৃতি স্মরণে তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের ভক্তি বিনম্র প্রণাম।

১১ পৌষ শ্রীশ্রীস্বামী-স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের স্মৃতি-ধন্য আবির্ভাব-স্মৃতি-স্মরণে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

২৭ পৌষ, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবস।

'বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ঘটাবে সমন্বয়,
বাঁচা ও বাড়ার দিব্য প্রেরণা ঘুচাবে অবক্ষয়।'

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয়রে চলে আয়, আয়, আয়। ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে, মরি হায়, হায়, হায়। পৌষ তাই শূন্যতার বিপক্ষে পূর্ণতার আহবান।

'শূন্য ক'রে ভ'রে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু ব'সে সারা বেলা।'

শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে
সব খোয়াবার সময় আজকের
হবে কখন কোন সকালে ॥

যাঁর শ্রীচরণে সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়ে আমরা অফুরন্তের আশ্রয় পাব– তিনিই আমাদের জীবন সর্বস্ব হোন। বন্দেপুরুষোত্তমম্ ॥

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

সঙ্কলয়িতাঃ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস; এম এ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

অতুলদা–শ্রাদ্ধ করলে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর–শ্রাদ্ধ মানে পিতৃপুরুষের স্মরণ-মনন-সহ শ্রদ্ধায় দান। ওতে আমাদের instinct (সহজাত সংস্কার)-গুলি nurtured (পরিপুষ্ট) হয়। আমরা উন্নত হ'য়ে উঠি।

অতুলদা– মা-বাপের মৃত্যুতে মানুষ উপবাস, হবিষ্য ইত্যাদি করে কেন? এই নিয়ম পালনের কাল-সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পার্থক্য কেন? কারও বেশী দিন, কারও কম দিন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর–শোকে মানুষের শরীরের উপর একটা আঘাত পড়ে। রক্তচলাচল ও শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির রসক্ষরণ অনেকখানি ব্যাহত হয়। তাতে হজমশক্তিও বিপন্ন হ'য়ে পড়ে। তাই যেমনতর খাদ্য হজম করতে পারে, যে-খাদ্যে ও চলনায় শারীরিক ও মানসিক স্থৈর্য্য ফিরে আসে, স্নায়ু সবল হয়, তেমনতর বিধান মেনে চলতে হয়। উদ্দেশ্য– শরীর মনের সাম্য ফিরিয়ে আনা। সাম্যসঙ্গত চলন যাদের যেমনতর আয়ত্ত, সেই অনুযায়ী দিনের তারতম্য করা হয় ব'লে মনে হয়। তাই দেখা যায়, উচ্চতর বর্ণের অপেক্ষাকৃত কম দিন। এটা আশা করা হয় যে তারা more controlled(বেশী সংযত)। অবশ্য এমনও হ'তে পারে যে উচ্চতর বর্ণোদ্ভুত হ'য়ে একজন less controlled (কম সংযত), কিন্তু অনুচ্চবর্ণের হ'য়ে একজন more controlled (বেশী সংযত)। কিন্তু সামাজিক বিধানগুলি গড়পড়তা-মত করা হয়। তবে একথা ঠিকই– বর্ণোচিত বিহিত জনন ও আচার-আচরণ যদি অক্ষুণ্ন থাকে, চরিত্রের উপর তার একটা প্রভাব পড়েই।

অতুলদা–মানুষ আজকাল পেটের ধান্ধাতেই পাগল। নিজেকে গড়ে তোলার দিকে তাই তত নজর দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর– নিজের চরিত্র অর্থাৎ চলন ঠিক ক'রে নিতে পারলে পেট-টেট সব ঠিক থাকে। গোঁজামিল দিয়ে পেট বাঁচাতে গেলে হয়তো বা পেট বাঁচে, হয়তো বা পেট বাঁচে না, কিন্তু যা' যা' বাঁচলে মানুষের মত বাঁচা হয়, সেগুলির আর সামঞ্জস্য হ'য়ে ওঠে না। তাই পেট বাঁচলেও দুঃখ ঘোচে না। কিন্তু মানুষের gualification (গুণ)-গুলির যদি meaningful active adjustment (সার্থক সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ) হয়, তাহ'লে সে স্বতঃই অর্জ্জী হ'য়ে ওঠে। শুধু টাকা-পয়সা নয়, যা' করতে যা'-যা' লাগে, সে সব কিছুই সংগ্রহ ক'রে নিতে পারে। ধর্ম্মকে যে অর্জ্জন ক'রে, অর্থার্জ্জন তার কাছে একটা সমস্যাই নয়। টাকা-পয়সা উপায় করতে যে পারেননি, সেটা কোন obsession (অভিভূতি)-এর জন্য। সেটা চ'লে গেলে দেখবেন, সব দোয়ারে আসবে। 'এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হ'তে দানে, গান হ'তে গানে'। পরিবেশের জন্য প্রাণ ঢেলে করতে হয়–অপ্রত্যাশী হ'য়ে।

'মনের সেবা কর আগে তুই
বাহ্য সেবা তার সাথে,
এমনতর চলায় জানিস্
শুভ আশিস্ পায় মাথে।'

ইষ্টের তৃপ্তির জন্য প্রত্যাশারহিত হ'য়ে এইভাবে মানুষের সেবা কর। দেখবে, মানুষ তোমাকে দেবার জন্য লালায়িত হ'য়ে উঠবে। কিন্তু তুমি হয়তো নিতেই চাইবে না। আমরা বৌকে, মাকে দিই কেন? দিয়ে তৃপ্তি পাই, তাইতো দিই। মানুষ যত অপরের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়, ততই মানুষের তাকে দেবার আগ্রহ হয়। দিয়ে তৃপ্তি পায়। তুমি যদি নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাক, কেবল টাকার কথা কও, তিন দিন পরে মানুষ তোমার কাছ থেকে পালাবে। তোমার বৌ যদি কেবল নিজের চাহিদা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তোমার দিক্‌টা না দেখে, তাহ'লে তাকেও তোমার দিতে ইচ্ছা করে না। যারা pauper (দারিদ্র-ব্যাধিগ্রস্ত), তাদেরই দেখবে–চরিত্র unfulfilling in many respects (অনেক দিক্ দিয়ে পূরণপ্রবণতাহীন), কাউকে তারা দিতে চায় না কিছু। দারিদ্র্যের একটা মস্ত বড় লক্ষণ– negative philosophy (নেতিবাচক দর্শন)। বলবে– কি করব! গরীব হ'য়েই যত পাপ করেছি। যারা pauper in mind (মনে দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত), pauper in character (চরিত্রে দৈন্যগ্রস্ত) অর্থাৎ ever unfulfilling unnurturing to environment (পরিবেশের প্রতি পূরণ ও পোষণহীন), তাদের দারিদ্র ঘোচান কঠিন ব্যাপার।

ছেলেপেলেরা সেবা-বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে পড়াশুনো করে না, টাকা উপলক্ষ্য ক'রে পড়ে। তাতে গোলামী ক'রে জীবন বওয়া ছাড়া আর পথ পায় না। অবস্থা নয়–'বাগেদবীং বানরীং কৃত্বা নর্ত্তয়ামি দ্বারে দ্বারে।' আমি বলি–'কিসে ভীরু তুমি, কিসে কাপুরুষ! জগতে তুমি কি নহ রে ধন্য!'

শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আবেগের সঙ্গে ব'লে চলেছেন। সবাই তাঁর কথা শুনে প্রেরণার অগ্নিদীপনায় ভরপুর হ'য়ে উঠছেন।

অতুলদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন– নিয়তি কি না-মেনে পারা য়ায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর– আমার করার ফল যা' আমার দৃষ্টির বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তাকে বলা যায় নিয়তি। আবার, আমার কর্ম্মের ফলে আমার ভিতর যে ঝোঁক ও সম্বেগ সৃষ্টি হ'য়ে আমাকে চারিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাও ঐ নিয়তিরই একটা রূপ। বহিরাগত কর্ম্মফল এবং আমার অন্তর্নিহিত ঝোঁক ও সম্বেগ যদি অশুভও হয়, তার শুভ নিয়ন্ত্রণ আমার হাতের মধ্যেই আছে। এই জন্যই ইষ্টকে ধরতে হয় ও তাঁর ইচ্ছা পূরণ ক'রে চলা লাগে। মঙ্গলের সঙ্গে বাঁধনটা যদি পাকা হয়, তাহ'লে অমঙ্গল তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। টাকায় পীরিত না হ'য়ে নারায়ণের সঙ্গে যদি পীরিত হয়, মা-লক্ষ্মী দুয়োরে হে'টে এসে বলেন, 'লে! লে! রে! কি লিবি লিয়ে লে।' Be rich in mind and deed and have riches (মনে এবং কর্ম্মে সম্পদশালী হও এবং তার ভিতর দিয়েই সম্পদের অধিকারী হও)। Habit মানে বলি, Have it (ইহা লও), আর behaviour বলতে বুঝি, to be have (হ'য়ে পাও) 'seek ye first the kingdom of heaven and all other things shall be added unto you (প্রথমে স্বর্গরাজ্যের অনুসন্ধান কর, তাহ'লে সব-কিছুই পাবে)।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন। নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছেন। চোখে-মুখে কী যেন একটা উদ্বেগের চিহ্ন। হয়তো দেশের, দশের ও জগতের ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় ভাবিত হ'য়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন–সপ্তাশ্ব চাই–যারা যে-কোন situation (অবস্থা) tackle (পরিচালনা) করতে পারবে। দরকার মত বিলেত, আমেরিকা যে-কোন জায়গায় যেতে পারবে। কেষ্টদা আছে, আর ৬ জন দরকার। যাদের কপাল আছে,তারাই আসবে।

একটু পরে কতকটা স্বগত উক্তির মত বলছেন–মানুষ কি ক্ষুদ্র অবস্থায় প'ড়ে থাকতে চায়? কিন্তু obsession (অনুভূতি)-এর দরুণ থাকে। obsession (অনুভূতি)-টা কাটিয়ে দিতে হয় এবং সেইটেই যাজন।

কালিষষ্ঠীমা প্রাণ খুলে সংসারের খুঁটিনাটি নানা-কথা বলতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে শুনছেন এবং মাঝে-মাঝে মৃদুমধুর তারিফের হাসি হাসছেন। চোখেও তাঁর প্রাণমাতানো হাসির ঝিলিক। একটা খুশির হাওয়া বইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে অতুলদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন–আপনার কিন্তু D.sc (ডি, এস-সি) হওয়াই চাই। ওটা আমার একটা luxury (বিলাসিতা)। আমি যা' করতে বলি, আমার luxury (বিলাসিতা) ব'লে করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের খাবার সময় হ'য়ে এলো ব'লে, ধীরে-ধীরে অনেকেই বিদায় নিলেন।

১৩ ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ১৮/১২/১৯৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে হাসিখুশিভাবে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), স্পেন্সারদা, মণিদা (ব্যানার্জি), যোগেনদা (হালদার), দক্ষিনাদা (সেনগুপ্ত) এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। সূর্য্য তখন অস্ত যায়-যায়, আশ্রমের সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত চরে ছায়া ঘনিয়ে আসছে। শীতের দিন একটু-একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আকাশ-বাতাস, গাছপালা, পশুপক্ষী, মানুষ, ঘরবাড়ী, মাটি সবটার মধ্যে কেমন যেন একটা বিচ্ছেদ-কাতর মায়ার আবেশ। এই সময়টিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দ-সঙ্গ বড় প্রিয় লাগছে সবার কাছে। এইতো ব্যথিত বুকের অক্ষয় আশ্রয়, এখান থেকে কখনও বিমুখ হ'তে হয় না কাউকে। তিনি চিরপ্রসন্ন হাসি নিয়ে সবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ হ'য়ে আছেন, মা যেমন উন্মুখ হ'য়ে থাকেন পেটের সন্তানের জন্য।

কলকাতা থেকে রবিদা (ব্যানার্জি) আসলেন, সঙ্গে তাঁর ভাগ্নে বিশু (মুখোপাধ্যায়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহোল্লাসে ব'লে উঠলেন–কি রে, কী খবর?

রবিদা ও বিশু প্রণাম ক'রে বললেন–ভাল।

রবিদা তাঁর এক ভাগ্নের তৈরী ভাল কয়েক রকম ফাউন্টেন পেনের কালি (লাল, কালো ইত্যাদি) শ্রীশ্রীঠাকুরকে উপহার দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহাখুশী হ'য়ে বললেন– খুব ভাল। দেখতে হয় যেন কোন খুঁত না থাকে। একেবারে বাজারের সেরা

কালি ক'রে তোলা লাগে। তোমরা যেটা ধ'রবে সেইটাতে efficiency (দক্ষতা)-র চূড়ান্ত দেখিয়ে দেওয়া চাই। লক্ষ্য রাখতে হবে, কত সুবিধায় কত ভালো জিনিষ দিতে পার। সেবাবুদ্ধি প্রবল হ'লে মাথাও খেলে তেমনি। আর দাঁও মারার বুদ্ধি হ'লে মাথা ভোতা হয়ে যায়। আরম্ভ করেছ তো খুব ভালো ক'রে লাগাও। এক-এক জন এক-এক ব্যাপারে successful (কৃতকার্য্য) হ'লে, তার দেখাদেখি আর দশজন দশটা ব্যাপারে লেগে যায়। কেউ বড় একটা চাকরী পেয়েছে শুনলে আমার মনে হয়, সে একটা বড় গোলাম হ'ল, সে ও তার ছেলেপেলেরা পর্য্যন্ত যেন একটা যাঁতাকলের মধ্যে প'ড়ে গেল, যা' থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া ভার। তাই মনে খুব স্ফূর্ত্তি পাই না। কিন্তু independently (স্বাধীনভাবে) কেউ কিছু করতে চেষ্টা করছে, তাতে successful (কৃতকার্য্য) হচ্ছে– এমনতর খবর পেলেই মনে হয় যেন আমি লাভবান হলাম। কারণ, তা'র ঐ অভিজ্ঞতার এবং যোগ্যতার একটা স্থায়ী মূল্য আছে।

রবিদা (ব্যানার্জী)–আপনি আশীর্বাদ করুন, যাতে ওরা আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)–আশীর্বাদ তো আমার আছেই, এখন সেই আশীর্বাদ সফল করা না-করা তোমাদের হাতে।

স্পেন্সারদা জিজ্ঞাসা করলেন–দুনিয়ায় difference (পার্থক্য) থেকেই তো যত discord (অমিল)। ভগবান এত successful (পার্থক্য)-সৃষ্টি করলেন কেন জগতে?

শ্রীশ্রীঠাকুর– difference (পার্থক্য) না থাকলে কেউ কাউকে fill (অনুভব)-ই করতে পারতাম না। কেবল আমিই যদি থাকি, আমা ছাড়া যদি কিছু না থাকে, তাহ'লে আমিও থাকি না, থাকলেও তা' বোধ করতে পারি না। তাই, স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন আছে। বৈশিষ্ট্য-ওয়ালা বহুর সহযোগের ভিতর-দিয়েই প্রত্যেকটি বিশেষ টিকে থাকে। একক কেউ টিকতে পারে না, তাই difference (পার্থক্য) চাই-ই। তবে Divine Unity-তে (ভাগবত ঐক্যে) যদি আমরা interested (অন্তরাসী) হই, তবে inspite of difference we enjoy one another, we enjoy to grow, and grow to enjoy (পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে উপভোগ করি, আমরা উপভোগ করি বৃদ্ধি পেতে এবং বৃদ্ধি পাই উপভোগ করতে)।

আহ্বান

ইষ্টপ্রাণেষু দাদা/ মা

রা-নন্দিত জয়গুরু। প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবারিত করুণায় পরমতীর্থধামে প্রতিদিনই বহু তীর্থযাত্রীর শুভাগমন ঘটে। এছাড়া আশ্রমে নিয়মিত ভক্তবৃন্দ এবং অবস্থানরত ছাত্রগণের দৈনন্দিন আনন্দবাজারের ব্যয় সংকুলানের ব্যাপারটি বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে সারাদেশে অবস্থিত ইষ্টপ্রাণ সুযোগ্য ভক্তবৃন্দের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে কিছু দায়িত্বগ্রহণ করতে পারেন। বছরের প্রতিদিনই অর্থাৎ ৩৬৫ দিনই জনপ্রতি ১দিন কেন্দ্রীয় আশ্রমে আনন্দবাজারের প্রসাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংযোগ করলে আশ্রমের অর্থনৈতিক সাশ্রয় ঘটবে এবং দায়িত্ব গ্রহণকারীর প্রতিও পরমপিতার কল্যাণ অবারিত বর্ষিত হবে।

তাঁর এই করুণাধারায় মিলিত হবার জন্য সবার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বিনয়াবনত–

সভাপতি
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

সাধারণ সম্পাদক
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

দিব্যবাণী

(বিধি-বিন্যাস)

–শ্রীশ্রীঠাকুর

পরার্থকে বিদায় দিয়ে
আত্মস্বার্থ সিদ্ধির বুদ্ধি
ঐ আত্মস্বার্থের পায়েই কুঠারঘাত ক'রে থাকে–
তা' মুখ্যতঃই হো'ক
আর গৌণতঃই হো'ক। ৫১।

স্বার্থ ও পরামার্থের ভিতর
যা'রা আপোসরফা ক'রে চ'লতে চায়,
এক-কথায়, পরমার্থই যা'দের স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি,–

স্বার্থ ও পরমার্থের ভিতর
যা'রা আপোসরফা ক'রে চ'লতে চায়,
এক-কথায়, পরমার্থই যা'দের স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি,–
বিক্ষুব্ধ বেঘোরেই
তা'দের আশ্রয় হ'য়ে থাকে। ৫২।

চাহিদা আছে
কিন্তু তদনুগ বিহিত চলন নেই–
অমন চাহিদাই
মানুষকে অবশ ক'রে তোলে। ৫৩।

তোমার চাহিদা ও চলা
সার্থ সুকেন্দ্রিকতায়
যেমনতর বিনায়িত হ'য়ে উঠবে,
হবেও তুমি তেমনি। ৫৪।

অহদ্য চাহিদার চাপ
ও অবাধ্যের কৈফিয়তের দাবী
মানুষকে যত মনমরা ক'রে তুলতে পারে,–
এমনতর অন্য কিছু কমই আছে। ৫৫।

যা'র প্রতি শ্রদ্ধার খাঁকতি
বা ভঅলবাসার খাঁকতি
কিন্তু চাহিদা উদাত্ত,
তা'র সম্বন্ধে বোধও বিকারগ্রস্ত। ৫৬।

যেমন চাহিদায় যা' কর,
বা যেমন ক'রে যা' হও,
ঈশ ।বর তা'ই-ই মঞ্জুর করেন,
পাও-ও তেমনি;
কথায় বলে–
'যা' চায়, তা'ই পায়,
বিধি কা'রউ বাম নয়'। ৫৭।

তোমাদের চাহিদা যেন
প্রস্তুতিবিহীন না হয়,
সর্ব্ব-সঙ্গতি নিয়ে
চাহিদার অনুপূরণী প্রস্তুতি-পদবিক্ষেপে
যা'রা চলে,–
কৃতকার্য্যও হ'য়ে ওঠে তা'রা প্রায়শঃ। ৫৮।

তোমার অন্তর্নিহিত চাহিদা
আগ্রহ-আতিশয্যে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
অনুবেদনী অনুধ্যায়িতায়
যতই নিজেকে বিনায়িত ক'রতে থাকবে,–
উত্তরকালে প্রকৃতি তোমাকে
ততই আপূরিত ক'রে তুলবে;
ঈশ্বর পরম বিভু,
তিনিই পরম পুরুষ। ৫৯।

তোমার অন্তরে
সুসঙ্গত ক্রিয়মাণ চাহিদা-সম্বেগ
যা' সত্তার আত্মিক সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
কর্ম্মে প্রতিফলিত হ'য়ে উঠছে,
ঈশ্বর তা'ই-ই মঞ্জুর ক'রে থাকেন্য–
তোমারই চাহিদামাফিক,
তা' ভালই হোক' আর মন্দই হো'ক;
ফল কথা, তোমার সুসঙ্গত কর্ম্মের অভিসারে
যে-চাহিদা বিন্যাস-মণ্ডিত হ'য়ে
নিষ্পাদন-তৎপর হ'য়ে ওঠে–
সম্বেগ-দীপনায়,–

ঈশ্বর তা'ই-ই সুসিদ্ধ করেন;
"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"–
ঈশ্বর কল্পতরু । ৬০ ।

অশাসিত প্রয়োজন
দুর্ভাগ্যেরই অগ্রদূত । ৬১ ।

উপযুক্ত প্রয়োজন ও বিনায়ন-কৌশলের উপরই
প্রাপ্তি নির্ভর করে । ৬২ ।

প্রয়োজন যেখানে সুকেন্দ্রিক ও প্রখর হ'য়ে ওঠে,
শক্তিও সেখানে
তুখোড় অভিব্যক্তিতে
আত্মপ্রকাশ করে । ৬৩ ।

প্রয়োজন যখন জীবন-চলনাকে ব্যাহত ক'রে
কেন্দ্রায়িত নিষ্ঠাকে বিচ্ছিন্ন করে,–
নিয়তি তা'কে তখনই ডাকতে থাকে,–
তা'র মোহিনী হাতছানি দিয়ে
পিপর্য্যয়ের দিকে । ৬৪ ।

দেওয়ার বাড়ে মমতা,
নেওয়ায় বাড়ে লোভ,
চরিত্রও রঙ্গিল হ'য়ে উঠতে থাকে তেমনি–
তদনুপাতিক;
আবার, শ্রেয়ার্থ-সন্ধিৎসা আনে মুক্তি–
তা' সব প্রবৃত্তিরই । ৬৫ ।

শুধু আত্মস্বার্থ-বাগানোর অভিসারেই
যদি চ'লতে থাক–
লোবর্দ্ধনার সক্রিয় অনুচর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে,–
ব্যর্থতার উপঢৌকনের জন্য প্রস্তুত থেকো । ৬৬ ।

সক্রিয় ইষ্টার্থ-অনুবেদনী সহযোগিতা,
তদনুচর্য্যী আবেগ-উদ্যম,
ঐক্য-বিনায়নী সংহতি
ও সমবেদনী পারস্পরিকতার অভাবের সহিত
আত্মাভিমানী মর্য্যাদাপ্রিয়তা
যেখানে যত,
দৈন্য-মর্ষিত অভাবের তাড়নাও
সেখানে তেমনি নাছোড়বান্দা । ৬৭ ।

তুমি যদি কা'রও সুখে
সুখী হ'তে না পার–
বিহিত বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার
বিনায়িত আপ্যায়নায়,
তুমি যা'তে সুখী হও
সে-সুখে অন্যে সুখী হবে কমই,
বরং, তোমার সুখ
অন্যের বৈরী দীপনাকেই
উস্‌কে তুলবে । ৬৮ ।

যা'রা অন্যের সমীচীন সুবিধা ও সন্তোষকে
উপেক্ষা ক'রে
নিজের সুবিধা ও সন্তোষের জন্য
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চলে,
তা'দের সুবিধা ও সন্তোষ
বিপর্য্যয়েরই
বিভ্রান্ত বিশৃঙ্খলা নিয়েই
পর্য্যুদস্ত হ'য়ে ওঠে । ৬৯ ।

কোন-কিছুতে প্রত্যাশা-নিবদ্ধ হ'য়ো না–
অন্ততঃ বিশেষ চাহিদায়,
প্রত্যাশা-নিবদ্ধ হ'য়ে যদি না পাও
নিরাশা হবে,
ঐ নিরাশা
অন্তরে বিরক্তি সৃষ্টি ক'রে রাখবে,
ফলে, পেছনে যদি
বৃহত্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে–

ঐ বিরক্তি বিরাগ
তা' হ'তে তোমাকে
বঞ্চিত করবার প্রয়াসেই
সজাগ হ'য়ে রইবে । ৭০ ।

চাহিদা তোমার যা'
তা' যদি পেতে চাও–
হ'তে হবে তোমার তেমনি
যা'তে তা' পাওয়া যেতে পারে
রাখা যেতে পারে,
নইলে পেলেও
থাকবে না তা' । ৭১ ।

কুৎসিত উপায়ে প্রাপ্তি
মানুষকে কুৎসিতেই
প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে,
আর, প্রাপ্ত যা'
তা'ও তদ্‌গুণান্বিতই হ'য়ে ওঠে—
এবং কুৎসিত ফলই প্রসব করে;
তাই, ঈশ্বরে পরিশুদ্ধ হয়—
আর, পরিশুদ্ধ ক'রে তোল
তোমার যা'-কিছুকে—
শুভ সাত্ত্বত বিনায়নে। ৭২।

যা'র স্বার্থে তুমি স্বার্থান্বিত,
যা'তে তুমি অন্তরাসী,
যা'র তুষ্টি ও তৃপ্তি
তোমার কাম্য, করণীয় ও আনন্দের,
যা'র জন্য
উপচয়ী আত্মত্যাগ ও ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
আত্মপ্রসাদ উপভোগ কর,
যা'র স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনায় তুমি দায়িত্বশীল,
এবং তা' সম্পাদন না ক'রলে
তোমার কষ্ট হয়,—
সেখানেই তোমার দাবী স্বতঃস্রোতা। ৭৩।

না ক'রেও যে তুমি পাও কখনও-কখনও
তা'র অন্তর্নিহিত মরকোচই হ'চ্ছে—
ভাবগত পরিবেষণী নীতির আবর্ত্তনে—
তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মফল
যে বোধি ও চাহিদার সৃষ্টি ক'রেছে,
তা' অলস-প্রকৃতি হ'লেও
ওরই তৃষ্ণা তোমাকে
ঐ আবর্ত্তনের উপকূলে দাঁড় করিয়াছে—
পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ত্তি ক'রতে,
তাই তুমি পাও ;
তোমার অন্তর্নিহিত কর্ম্মানুগ বোধিদীপনা
যদি না থাকতো
আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগই হ'তো না তোমাতে,
আর, দিলেও তুমি পেতে না;
আবার, বিনা চেষ্টায় যা' পা'চ্ছ
তা'ও তুমি ততটুকুই ভোগ ক'রতে পার—
বোধি-সঙ্গতি ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,—
যতটুকু তা'কে হজম ক'রতে পার,
তা' বাদে আবার ঐ নিয়মেই
ব্যয়িত হ'য়ে যাবে তা' ;
পেলে ব'লে ভেবো না—
দয়ার দিকে না এগিয়েও
না ক'রেও
যোগ্যতায় বোধি জাগ্রত না হ'য়েও
পাওয়া যায় ;
আবার, বহুত ক'রেও যে কম পাও
তা'র মানে—
তোমার বোধ-সঙ্গতি, ব্যবস্থিতি, ব্যবহার
ও নিষ্পাদনী দক্ষতার ভাণ্ডারে
খাঁকতি আছে,
যা'র ভিতর-দিয়ে
অনেকখানি বেরিয়ে যায়। ৭৪।

লোকে বলে
সময় হ'লেই হবে,
আর বলেও—
যা'র যেমন চাহিদা,
তা'কে লক্ষ্য ক'রে ;
এ-কথাটা খানিকটা সত্য হ'লেও
তা'দের অভ্যস্ত ধারণা যেমনতর
তা' কিন্তু নয়,
তোমার চাহিদামাফিক চলনা
যেমনতর সহজ ও সম্যক্ হ'য়ে উঠবে—
হবেও তেমনি,
পাবেও তাই ;
তোমার চলনার বিনায়নই
ঐ হওয়াকে নির্দ্ধারিত করে,
আর, তা' ত্বরিত কি বিলম্বে,
তা'ও তা'রই উপরে ;
তুমি যেমনটি চা'চ্ছ
চাওয়া-অনুপাতিক যেমনটি চ'লছ,
সেই চলনায় যা' হ'তে পারে,—
ঈশ্বর তা'তে রাজী হ'য়েই আছেন,
তাই তিনি কল্পতরু। ৭৫।

মাতৃদীপনা

(মায়েদের জন্য বিশেষ সাহিত্য আসর)

সেবা বিধায়না

–শ্রীশ্রীঠাকুর

অহঙ্কার যত রকমারিতেই
অভিব্যক্ত হো'ক না কেন,
তুমি তা'র সেবক–
যিনি তোমার প্রিয়পরম,
এই আত্মপ্রসাদী অহংই শ্রেয়ধর্ম্মী;
আর, সেবা মানেই
সংরক্ষণী, সম্পোষণী, সম্পূরণী
সন্ধিৎসু বীক্ষণায়
বিহিত প্রয়োজন-পূরণে
যথাসময়ে যেমন ক'রে যা' ক'রতে হয়
তদর্থে তা' করা,
আর, ঐ সেবাই লক্ষ্মী,
আর লক্ষ্মীই শ্রী,
আর, ঐ শ্রীই সার্থক হ'য়ে থাকে ঈশ্বরে। ১৩৫।

মনে রেখো,
সর্ব্ব প্রথমেই তুমি
তোমার ঈশপ্রবুদ্ধ, বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ ইষ্ট যিনি তাঁ'র,
দ্বিতীয়তঃ
তুমি তোমার পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ,
রাষ্ট্র ও কৃষ্টির সমর্থক যা'রা, তা'দের,
তারপর, তুমি
তোমার শ্রেয়ে আলম্বিত থেকে
সুনিষ্ঠ অনুচর্য্যী অনুপ্রাণনায়
ভর-দুনিয়ার সৎসন্দীপী যা'-কিছু সবারই–
প্রতি প্রত্যেকেরই;
তোমার উদগতিশীল জীবন দাঁড়া
যদি সুষ্ঠু ও সংস্থা না থাকে,–
তবে তোমার বিস্তার বা বর্দ্ধনা
একটা হাস্যোদীপক কথা মাত্র,
তা' একটা পচনশীল
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ছাড়া
আর কিছুই নয়। ১৩৬।

মন্দির বা প্রার্থনাগৃহ যা'দের
অপরিশুদ্ধ, অব্যবস্থিত,
শ্রদ্ধা-উচ্ছল তত্ত্বাবধানহীন,
প্রীতি-পরিচর্য্যাহারা,
মন্দির-অনুচর্য্যা যা'দের
সার্থক হ'য়ে ওঠেনি আদর্শে
পূরয়মাণ জীবন্ত ইষ্টে,–
তা'রা যে দিক্‌হারা অধঃপাতী পন্থায় চ'লেছে
ঐ তা'র নিশানা,–
তা' পরিবারেই হো'ক,
সমাজ, সম্প্রদায় বা দেশেই হো'ক;
ও দেখলেই তন্মুহূর্ত্ত থেকেই
সাবধান হওয়া উচিত–
অনুরাগ-অধ্যুষিত বাব ও চলনে
সেবাকে তেমনতরই নিয়ন্ত্রণ করা উচিত–
পারস্পরিকভাবে সহযোগিতার সহিত
সমবেত সংহতি নিয়ে। ১৩৭।

শ্রেয়ার্থী সম্বেগে
মানুষের আপদ, বিপদ, দুঃখ-দৈন্য
আঘাত-ব্যাঘাতে স্বতঃদায়িত্ব নিয়ে
হৃদ্য বাক্য ও ব্যবহারের সহিত
উপযুক্ত বোধি-পরিচর্য্যায়
যা'তে তা'রা নিস্তার লাভ করে
যথাসাধ্য তা' হ'তে এক পাও পিছু হ'টো না,
তোমার আওতায়, দৃষ্টিপথে
যা'র অমনতর অবস্থা দেখবে–
অমনি জাগ্রত প্রহরীর মতন
আশা ও সুস্থির অনুবেদনা নিয়ে
তা'দের সম্মুখে দাঁড়াতে কসুর ক'রো না,
বোধি ও প্রচেষ্টার সুব্যবস্থিতিতে
নিস্তার-নন্দনায়
তা'দের মুখে হাসি ফোটাও,

এই নিস্তার-প্রগতি-দীপনা
তোমাকে যোগ্যতার অভিভাষণে
আত্মপ্রসাদ-নন্দিত ক'রে তুলবে,
সুখী হবে। ১৩৮।

তোমার সেবা ও সরবরাহ
অন্যকে যতই
সৌন্দর্য্যতৃপ্ত ক'রে তুলতে পারবে,
তুষ্টিপ্রসন্ন ক'রে তুলতে পারবে,-
অন্যেও তোমাতে তত অন্তরাসী হ'য়ে উঠবে,
তোমার সেবা বা সরবরাহকে পছন্দ ক'রে
তা'ই উপভোগ ক'রতে চাইবে,
আর, ঐ চাওয়াই
তোমার প্রাপ্তিকে উচ্ছল ক'রে তুলবে,
তাই, শুভ প্রচেষ্টায়
মানুষকে শুভস্ফূর্ত্ত ক'রে তোল,
প্রতিক্রিয়ায়
শুভ পুষ্টিতেই তুমি পুরস্কৃত হ'য়ে উঠবে। ১৩৯।

তোমার দয়া
দয়াতেই দাঁড়িয়ে
ইষ্টানুগ অনুশাসনে
দাক্ষিণ্য-অনুচর্য্যায়
পাপের কাছে যতই ভীতিপ্রদ হ'য়ে উঠবে
ভয়াল হ'য়ে উঠবে-
তোমাতে তোমার দয়া
ততই এমনতর ব্যক্তিত্ব লাভ ক'রবে
যা'র সৌকর্য্য-সন্দীপনায়
কুশল-কৌশলী যোগ্যতার
প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতিতে
অবনত হ'য়ে রইবে সে,
দয়াও হবে সেখানে সার্থক,
তখনই তোমার সংস্পর্শে
সাধু পাবে পরিত্রাণ,
দুষ্কৃতেরও হ'তে থাকবে অবলোপ। ১৪০।

রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত যা'রা-
ইষ্টানুগ প্রবুদ্ধ জীবন-প্রেরণা নিয়ে
নিরাকরণী স্বস্তি-প্রণোদনায়
তা'দিগকে তত্ত্বাবধান ও সাহায্য ক'রতে
পশ্চাৎপদ হ'য়ো না-
তোমার যোগ্যতা
যেমন যোগান দিতে পারে
তা'র একটুও ত্রুটি না ক'রে,
এই সানুকম্পী, সক্রিয়, জাগ্রত সেবা-সন্ধিৎসায়
তুমি স্বতঃই জীবন-প্রগতির
অনুশীলন-প্রবৃত্তি-পরায়ণ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
আর, ঐ-পথেই
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
জীবন-অভিদীপনায়
সম্বুদ্ধ ক'রে তুলবে তোমাকে। ১৪১।

যা'রা তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দেয়,
ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেয়,
রুগ্নকে নিরাময় করে,
দুর্ব্বলকে সাহায্যে সবল ক'রে তোলে-
শোকার্ত্তকে সন্দীপ্ত ক'রে তোলে সান্ত্বনায়-
সুশীল-সৌজন্যে
ইষ্টানুগ সম্বোধি-পরিচর্য্যায়,
গৃহহারা, আশ্রয়হারা অভ্যাগত যা'রা
তা'দিগকে যা'রা আশ্রয়ে সুস্থ
ও শ্রীসমন্বিত ক'রে
ধর্ম্মে অভিদীপ্ত ক'রে তোলে-
যোগ্যতার যোগ্য অনুচর্য্যায়
আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোলে-
ঈশ্বরেরই সেবা করে তা'রা
প্রত্যক্ষভাবে। ১৪২।

কা'রো আপদে-বিপদে, ব্যাপারে-বিধানে,
সুখে-সমৃদ্ধিতে
প্রত্যাশারহিত হ'য়ে
ইষ্টানুগ পথে শ্রদ্ধার্হ চলনে
সৌহার্দ্দ্য ও সহযোগিতা নিয়ে
শক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য যে-সেবা-
তা'ই কিন্তু সহযোগিতাকে স্বতঃ ক'রে তুলে'
পারস্পরিক সঙ্গতি নিয়ে আসে-
একই মন্ত্রে
একই আকৃতি নিয়ে

একই অভিপ্রায়ে
সমসার্থকতায় ;
তুমি যেই হও না কেন
স্বতঃপ্রণোদনায় শুভেচ্ছাপ্রবণ হ'য়ে
পরিবেশে এমনতর সেবায়
বিমুখ থেকো না,
আন্তরিক গুণাবলী গুণিত হ'য়ে
ক্রমশঃই তোমাতে অভ্যস্ত পরিক্রমায়
প্রকৃত হ'য়ে উঠবে । ১৪৩ ।

আর্ত্তপ্রাণে, আর্ত্তস্বরে কেউ যখন
'দয়াল' ব'লে আর্ত্তনাদ করে,
ঠিক জেনো, সে তোমারই অন্তর্নিহিত
সত্তা-সংহিত ঈশ্বরকেই ডাকছে–
যিনি সুপ্ত হ'য়ে আছেন তোমাতে
সত্তানুস্যূত প্রবৃত্তির অনন্ত শয্যায়,
সেই তোমাকেই সে ডাকছে–
তা'র আপদ-নিরাকরণের জন্য,
হাত বাড়িয়ে তুমি তা'কে কোল দেবে ব'লে,
আপদ-নিরাকরণে
তা'কে নিরাকৃত ক'রে তুলবে ব'লে,
ক্রূর প্রবৃত্তি-অভিভূতি এড়িয়ে
বেদনার বিক্ষুব্ধ আঘাত থেকে
বাঁচাবে ব'লে তা'কে,
মৃত্যুর কবল থেকে কেড়ে নেবে তা'কে–
তা'রই আকুল আগ্রহে;
মুখ ফিরিয়ে থেকো না,
অবজ্ঞা-কটাক্ষে চেয়ো না তা'র দিকে,
শ্লথ, স্থবির
ও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থেকো না তা'র প্রতি,
তোল, ধর, কোলে নাও,
নিরাকৃত ক'রে তোল তা'কে–
ঈশিত্ব
নন্দিত উচ্ছ্বাসে
তোমার সত্তাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে । ১৪৪ ।

সাবধান থেকো–
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে,
লোকের কাছে বদান্য হবার আশায়
লোক দেখিয়ে
কাউকে দান ক'রতে যেও না,
উপকারও ক'রতে যেও না,
অযথা লোকের কাছে
ব'লেও বেড়িও না,
এমন-কি, তোমার দক্ষিণ হস্ত
মানুষের যা' উপকার করে,
বাম হস্তও যেন তা'
জানতে না পারে,
যা' ক'রবে–
তা' সহজ প্রাণন-উৎসারণা নিয়ে,
ভগবান্ ঈশাও
এমনতর কথাই ব'লেছেন । ১৪৫ ।

সেবা ও সঙ্গ করার লক্ষ্য
যদি তোমার জীবিকা-আহরণ ও
উপভোগের ইন্ধন হ'য়ে ওঠে,–
সে-সেবা বা সঙ্গ
তোমার জীবনকে কখনও
উন্নতি-অভিদীপ্ত ক'রে তুলবে না,
কারণ, যা'কে সেবা ক'রছ
সে তোমার লক্ষ্য নয়কো, উপলক্ষ মাত্র,
লক্ষ্য হ'চ্ছে, জীবিকা ও উপভোগ ;
সেই জন্য তুমি
লাখ দেবতা বা মহাপুরুষের সেবা
কর না কেন,
লক্ষ্য যদি ঐ হয়–
অলক্ষ্যে ভাগ্যচক্র
তোমার উন্নতিকে অবহেলা ক'রে
দুর্ভোগহমর্দ্দিত হ'য়ে চ'লবে,
তুমি উন্নতি-বিবর্ত্তিত হ'তে পারবে না । ১৪৬ ।

ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো

(অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড)

–শ্রীশ্রীঠাকুর

প্রীতিদীপ্ত ইষ্টনেশা
বাড়বে যত যেই তালে,
দরদভরা গণপ্রীতি
বাড়বে তেমনি সেই চালে। ৫৯।

প্রীতির নেশায় ভাববৃত্তি
কৃতিচলায় হ'লে অবাধ,
উন্নতি তা'র স্বতঃই ফোটে
ভেঙ্গে-চুরে কামের বাঁধ। ৬০।

প্রীতির আবেগ বোধ-বিবেকে
নিষ্ঠা নিয়ে যতই বাড়ে,
নিখুঁত চলার দক্ষ করায়
সুসর্জ্জনায় রাখেই তা'রে। ৬১।

তোর অনুরাগই তো তোর উদ্গাতা
ইষ্টনিষ্ঠায় তপ্ত যা',
তপশ্চর্য্যা-রাগেই আনে
নিদেশ-পালায় সততা। ৬২।

প্রতিষ্ঠাই যদি চাস্ ওরে তুই
প্রতিষ্ঠ হ' ইষ্টরাগে,
সেই রাগেরই নিয়ন্ত্রণায়
সব-কিছুকেই আনিস্ বাগে;
ইচ্ছা আসে প্রীতির টানে
নিষ্ঠাতে হয় প্রতিষ্ঠা,
জীবনদ্যুতি প্রীতিই জাগায়
ইষ্টেতে হয় সুনিষ্ঠা। ৬৩।

প্রীতি হ'লেই কৃতি আনে
প্রিয়'র স্বস্তি-উপচয়,
কৃতিহারা ব্যস্ত-বিপুল
প্রীতির ঠাটটি অমন নয়। ৬৪।

প্রীতিই আনে কৃতিচর্য্যা–
ধৃতিচর্য্যার আশীর্ব্বাদ,
সুকৃতিরই জীবনতপে
কাটেই বহুৎ বিসম্বাদ। ৬৫।

ইষ্টপ্রীতির মহান্ তালে
সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্টি জাগে–
জ্ঞান-লোচনের বিশদ দেখায়
প্রজ্ঞা-রঙিল জ্ঞানের ফাগে। ৬৬।

উর্জ্জীতেজা নতি নিয়ে
রতি বাড়াও ইষ্ট-প্রতি,
ধৃতি-পথে সজাগ থেকো
কৃতিপূজায় রেখে নতি। ৬৭।

প্রীতির সহিত আদান-প্রদান
চর্য্যা-নিপুণ অন্তরে,
পারস্পরিক সংহতি আনে
ভুলত্রুটি সব দূর ক'রে। ৬৮।

তোমার প্রতি যেমন প্রীতি
সেই প্রীতিকে লক্ষ্য ক'রে,
অন্যের প্রীতি-চর্য্যা নিয়ে
চল্ এগিয়ে দেখে ধীরে। ৬৯।

ওজোদীপ্ত নয় যে প্রীতি
নাইকো যাতে উর্জ্জনা,
নিষ্ঠা-বিহীন এমন প্রীতি
রাখিস্ জেনে প্রীতিই না। ৭০।

প্রীতির ঝলক দেখবে যেথায়
তোমা-ছাড়া আর চলে নাকো,
দাঁত-খিঁচিয়ে, কড়া কথায়
প্রণয় কিনা খতিয়ে দেখো;

অপ্রীতিকর ধমক দিয়ে
দেখো প্রীতি কেমন টেঁকে,
প্রিয় তোমার কতখানি
বুঝে নিও সেইটি দেখে। ৭১।

আবোল-তাবোল যতই ভাবিস্
প্রিয়তমের দোষ ব'লে,
প্রীতি যদি সত্যি হয় তোর
তা' কি ছুটে যায় চ'লে? ৭২।

জুলুমবাজি নাই দরদে,–
হৃদ্য-চর্য্যা ল'য়ে
নেওয়া-দেওয়ার সার্থকতা
চ'লছে শুধু ব'য়ে। ৭৩।

ঢেউয়ের মত চলে জীবন
ওঠানামার তাল-বেতালে,
সব-কিছুরই হয় সমাধান
সাগর-স্রোতায় যদি চলে। ৭৪।

মান-অপমান, সুখ-সম্পদ্
সব দিয়ে যা'রে ভালবাসিস্,
রাগ-বিরাগ আর বিরক্তি সব
ঝেড়ে ফেলে তা'র চর্য্যা করিস্ ;
মান-অপমান, সুখ-দুঃখের
সব লালসা ছেড়ে দিয়ে,
প্রেষ্ঠ-স্বার্থ প্রেষ্ঠ-প্রীতি
একটানা থাক তাঁ'কেই নিয়ে। ৭৫।

অভিমান-শূন্য প্রীতি
চর্য্যামুখর ভজন-সেবা,
উচ্ছলাতে আনেই কিন্তু
সব সৌভাগ্যের স্বস্তি-বিভা। ৭৬।

মনের মানুষ থাকলে একটি
আর কি কেহ হয়?
চর্য্যা-সেবা চ'লতে পারে
আচরণে কিন্তু নয়। ৭৭।

কান্তাভাবের লক্ষণ দেখো
দেওয়া-থোওয়া-সেবা-চলনে,
নিজের স্বার্থে আগুন দিয়েও
কান্ত-স্বার্থ পালে কেমনে ;
বারনারীর কিন্তু উল্টো বোধ–
রং-ঢং আর কথার ছলে,
কেমন ক'রে রাখতে পারে
স্বার্থ-সেবায় সুকৌশলে ;
কান্তস্বার্থীর লক্ষণই কিন্তু
দেওয়া-থোওয়ায় সেবার টান,
নিজের স্বার্থে আগুন দিয়েও
কান্ত-স্বার্থই তাহার প্রাণ। ৭৮।

যা'র তরে তুই অন্যে ছেড়ে
তা'কে নিয়ে সুখী থাকিস্,
ঠিক জানিস্ তুই সুখে-দুঃখে
তৃপ্তিতেই তা'য় ভালবাসিস্। ৭৯।

যা'র কথা তুই এড়াতে নারিস্
দরদ কিন্তু সেইখানে,
কৃতিরাগে যা' জাগে তোর
তা'ই-ই কিন্তু রয় প্রাণে। ৮০।

দু'জনাকেই ভালবাসিস্
প্রিয়-প্রেষ্ঠ উভয়কেই,
সত্তাস্বার্থে যে-জন স্বার্থী
প্রেষ্ঠ কিন্তু তোরই সেই। ৮১।

প্রেষ্ঠ তোমার হ'লেই প্রিয়,–
থাকুক যত রঙ্গিল চোখ,
নিষ্ঠাপ্রতুল অনুরাগে
থামবে নাকো তোমার ঝোঁক। ৮২।

যা'কেই তুমি প্রেষ্ঠ বল
প্রিয় তোমার যতই সে,
রাগদীপনী চর্য্যা তত
দেয় দেখায়ে তাঁ'র দিশে। ৮৩।

দেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই তো দিনের পর দিন, আলোকের পর আলোক আসছে। কতকাল থেকেই আসছে, প্রত্যহই আসছে। এই আলোকের দূতটি পুষ্পকুঞ্জে প্রতিদিন প্রাতেই একটি আশা বহন ক'রে আনছে; যে কুঁড়িগুলির ঈষৎ একটু উদ্‌গম হয়েছে মাত্র তাদের বলছে, 'তোমরা আজ জান না, কিন্তু তোমরাও তোমাদের সমস্ত দলগুলি একেবারে মেলে দিয়ে সুগন্ধে সৌন্দর্যে একেবারে বিকশিত হয়ে উঠবে।' এই আলোকের দূতটি শস্যক্ষেত্রের উপরে তার জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ স্থাপন করে প্রতিদিন এই কথাটি বলছে, 'তোমরা মনে করছ, আজ যে বায়ুতে হিল্লোলিত হয়ে তোমরা শ্যামল মাধুর্যে চারিদিকে চক্ষু জুড়িয়ে দিয়েছ এতেই বুঝি তোমাদের সব হয়ে গেল, কিন্তু তা নয়, একদিন তোমাদের জীবনের মাঝখানটি হতে একটি শিষ উঠে একেবারে স্তরে স্তরে ফসলে ভরে যাবে।' যে ফুল ফোটে নি আলোক প্রতিদিন সেই ফুলের প্রতিক্ষা নিয়ে আসছে, যে ফসল ধরে নি আলোকের বাণী সেই ফসলের নিশ্চিত আশ্বাসে পরিপূর্ণ। এই জ্যোতির্ময় আশা প্রতিদিনই পুষ্পকুঞ্জকে এবং শস্যক্ষেত্রকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই প্রতিদিনের আলোক, এ তো কেবল ফুলের বনে এবং শস্যেও খেতে আসছে না। এ যে রোজই সকালে আমাদের ঘুমের পর্দা খুলে দিচ্ছে। আমাদেরই কাছে এর কি কোন কথা নেই ? আমাদের কাছে ও এই আলো কি প্রত্যহ এমন কোন আশা আনছে না যে আশার সফল মূর্তি হয়তো কুঁড়িটুকুর মতো নিতান্ত অন্ধভাবে আমাদের ভিতরে রয়েছে, যার শিষটি এখনও আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে উর্ধ্ব আকাশের দিকে মাথা তোলে নি?

আলো কেবল একটিমাত্র কথা প্রতিদিন আমাদের বলছে, 'দেখো।' বাস্‌। 'একবার চেয়ে দেখ।' আর কিছুই না।

আমরা চোখ মেলি, আমরা দেখি। কিন্তু সেই দেখাটুকু দেখার একটু কুঁড়িমাত্র, এখনও তা অন্ধ। সেই দেখায় দেখার সমস্ত ফসল ধরবার মতো স্বর্গাভিগামী শিষটি এখনও ধরে নি। বিকশিত দেখা এখনও হয় নি, ভরপুর দেখা এখনও দেখি নি।

কিন্তু, তবু, রোজ সকালবেলায় বহুযোজন দূর থেকে আলো এসে বলছে, 'দেখো'। সে-ই যে একই মন্ত্র রোজই আমাদের কানে উচ্চারণ করে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি দেখার অঙ্কুর রয়েছে যার পূর্ণ পরিণতির উপলব্ধি এখনও আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু, এ কথা মনে করো না আমার এই কথাগুলি অলংকারমাত্র। মনে কোরো না, আমি রূপকে কথা কচ্ছি। আমি জ্ঞানের কথা, ধ্যানের কথা কিছু বলছি নে, আমি নিতান্তই সরলভাবে চোখে দেখার কথাই বলছি।

আলোক যে দেখাটা দেখায় সে তো ছোটখাটো কিছুই নয়। শুধু আমাদের নিজের শয্যাটুকু, শুধু ঘরটুকু তো দেখায় না–দিগন্তবিস্তৃত আকাশমণ্ডলের নীলোজ্জ্বল থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ধরে সে কি অদ্ভুত জিনি! তার মধ্যে বিস্ময়ের যে অন্ত পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতিদিনের যেটুকু দরকার তার চেয়ে সে যে কতই বেশি!

এই-যে বৃহৎ ব্যাপারটা আমরা রোজ দেখছি এই দেখাটা কি নিতান্তই একটা বাহুল্য ব্যাপার? এ কি নিতান্ত অকারণে মুক্তহস্ত ধনীর অপব্যয়ের মতো আমাদের চারদিকে কেবল নষ্ট হবার জন্যেই হয়েছে? এতবড় দৃশ্যের মাঝখানে থেকে আমরা কিছু টাকা জমিয়ে, কিছু খ্যাতি নিয়ে, কিছু ক্ষমতা ফলিয়েই যেমনি একদিন চোখ বুজব অমনি এমন বিরাট জগতে চোখ মেলে চাবার আশ্চর্য সুযোগ একেবারে চূড়ান্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে! এই পৃথিবীতে যে আমরা প্রতিদিন চোখ মেলে চেয়েছিলুম এবং আলোক এই চোখকে প্রতিদিনই অভিষিক্ত করেছিল, তার কি পুরো হিসাব ওই টাকা এবং খ্যাতি এবং ভোগের মধ্যে পাওয়া যায়?

না, তা পাওয়া যায় না। তাই, আমি বলছি, এই আলোক অন্ধ কুঁড়িটির কাছে প্রত্যহই যেমন একটি অভাবনীয় বিকাশের কথা বলে যাচ্ছে, আমাদের দেখাকেও সে তেমনি 'করেই আশা দিয়ে যাচ্ছে যে, 'একটি চরম দেখা, একটি পরম দেখা আছে, সেটি তোমার মধ্যেই আছে। সেইটি একদিন ফুটে উঠবে বলেই রোজ আমি তোমার কাছে আনাগোনা করছি।'

তুমি কি ভাবছ, চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথা আমি বলছি? আমি এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি। চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে তুমি ঘৃণা করবে এত বড়ো লোকটি তুমি কে? আমি বলছি, এই চোখ দিয়েই, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা–তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এত বড়ো এই গ্রহতারাচন্দ্রসূর্য-খচিত প্রাণে-সৌন্দর্যে-পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা

আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে । এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চরম সফলতা কি বিজ্ঞান? সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, নক্ষত্রগুলি এক-একটি সূর্যমণ্ডল–এই কথাগুলি আমরা জানব বলেই এত বড় জগতের সামনে আমাদের এই দুটি চোখের পাতা খুলে গেছে? এ জেনেই বা কী হবে?

জেনে হয়তো অনেক লাভ হতে পারে, কিন্তু জানার লাভ সে তো জানারই লাভ; তাতে জ্ঞানের তহবিল পূর্ণ হচ্ছে–তা হোক । কিন্তু, আমি যে বলছি চোখে দেখার কথা । আমি বলছি, এই চোখেই আমরা যা দেখতে পাব তা এখনও পাই নি । আমাদের সামনে আমাদের চার দিকে যা আছে তার কোনোটাকেই আমরা দেখতে পাই নি–ওই তৃণটিকেও না । আমাদের মনই আমাদের চোখকে চেপে রয়েছে–সে যে কত মাথামুণ্ড ভাবনা নিয়ে আছে তার ঠিকানা নেই–সেই অশনবসনের ভাবনা দিয়ে সে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রেখেছে– সে কত লোকের মুখ থেকে কত সংস্কার নিয়ে জমা করেছে–তার যে কত বাঁধা শব্দ আছে, কত বাঁধা মত আছে, তার সীমা নেই–সে কাকে যে বলে শরীর কাকে যে বলে আত্মা, কাকে যে বলে হেয়, কাকে যে বলে শ্রেয়, কাকে যে বলে সীমা কাকে যে বলে অসীম তার ঠিকানা নেই–এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা চাপা দেওয়াতে আমাদের দৃষ্টি নির্মল নির্মুক্ত ভাবে জগতের সংস্রব লাভ করতেই পারে না ।

আলোক তাই প্রত্যহই আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে, 'তুমি স্পষ্ট করে দেখো, তুমি নির্মল হয়ে দেখো, পদ্ম যেরকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো ।' কাকে দেখবে? তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই । সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে । চারিদিকেই রূপ–কেবলই এক রূপ থেকে আর-এক রূপের খেলা; কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না– দেখেও পাইনে, ভেবেও পাই নে । রূপের ঝরনা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রবাহিত হয়ে সেই অনন্তরূপসাগরে গিয়ে ঝাপ দিয়ে পড়ছে । সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে । আজ যা দেখছি, এই-যে চারি দিকে আমার যে- কেউ আছে যা-কিছু আছে, এদের একদিন যে কেমন করে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখব তা আজ মনে করতে পারি নে–কিন্তু এটুকু জানি, আমাদের এই চোখের দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্তা আনছে তা এখনও কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি । এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দরূপ, সে দেখা এখনও অনেক বাকি–'আনন্দরূপমৃতং' এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেই দিনই তারা সার্থক হবে । সেইদিনই তাঁর সেই পরমসুন্দর প্রসন্নমুখ, তাঁর 'দক্ষিণং মুখং,' একেবারে আকাশে তাকিয়ে দেখতে পাবে । তখনই সর্বত্রই নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে–তখন ওষধি বনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না–তখন আমরা সত্য করেই বলতে পারব: যো বিশ্ব ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ।

দৃষ্টি আকর্ষণ

সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার জন্য আপনার বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করুন । সেই সাথে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন ।

সৎসঙ্গ সংবাদ প্রেরণকারী/ লেখকবৃন্দের প্রতি সবিনয় অনুরোধ-পরিচ্ছন্ন কাগজের একপাশে স্পষ্টাক্ষরে লেখা হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

-সম্পাদক

আমি তোমাকে ভালোবাসি

জগদীশ দেবনাথ

(তিন)

পাবনা হিমাইতপুর সৎসঙ্গে ক'বছর আগেও সমবেত প্রার্থনায় ধ্যানান্তে 'দয়াল আমার, প্রভু আমার' বাণীটি সমস্বয়ে আবৃত্তি করা হত। অতঃপর বাণীটি মূল প্রার্থনার ক্রমিকে যুক্ত করা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। ফলস্বরূপ, পাবনা হিমাইতপুর কেন্দ্রিক সৎসঙ্গে এই বাণীটি এখন আর পাঠ করা হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণীত অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ডের 'প্রার্থনা' শীর্ষক সর্বশেষ বাণী এটি। এর ভাব ও ভাষা ভক্ত চরিত্রের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত, তাই ব্যাখ্যা করে। বাণীটিতে একজন ভক্ত কেমন করে যথার্থ অর্থে ঠাকুরের মানুষ হয়ে উঠবে সে কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। যে কোন ইষ্টপ্রাণ মানুষই এই বাণী পাঠে অভিভূত হবেন। ভক্তের ভক্তির পরাকাষ্ঠা কেমন হবে, ইষ্টের সাথে ভক্তজনের কেমন সম্পর্ক এ সবই এই বাণীর ছত্রে ছত্রে অনুরণিত হচ্ছে। এই দীর্ঘ বাণীর কিছু স্তবকের উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

'..

তাড়ন-পীড়ন যা কর তুমি
অনাহারে বা উপহারে রাখ,
তাকাও কিনা আমার দিকে
কিংবা ঘৃণার চক্ষে দেখ,
যাই করনা তুমি আমার
আমি তোমার চিরদিনের
তোমার সেবাই আমার ধর্ম,
তোমার কাজই আমার তপের,
স্বার্থ আমার তুমিই শুধু
কোন প্রয়োজন স্বার্থ নয়,
ভরদুনিয়ায় যা হোক না' হোক
তোমার অতৃপ্তিই করি যে ভয়;
....।' ইত্যাদি।

প্রভুর তাড়ন-পীড়ন, স্নেহ-ঘৃণা, অনাহারে কিংবা উপহারে রাখা কোন কিছুতেই তুষ্ট, হরষিত, বিচলিত বা বিরক্ত না হয়ে তাঁর সেবা বা কাজই হচ্ছে একজন ভক্তের তপস্যা। একমাত্র প্রভুই আমার স্বার্থ, তাঁর অতৃপ্তিই আমার ব্যর্থতা ও ভয়ের কারণ। বাণীর একস্থানে আছে–

'শাসন বাক্য তোমার যে সব
সেই তো আমার আশীর্বাদ
অটুট চলায় চলে আমার
যাক টুটে যাক সব বিষাদ।'

ঠাকুরের দেয়া অনুশাসন বা উপদেশ বিনা-ওজরে, যথার্থ ভাবে মেনে চললেই সকল বিবাদের অবসান হয়। তাঁর শুভাশিষ অজচ্ছল ধারায় নেমে আসে। জীবন তখন হয় অনাবিল, সুন্দর। আবার দায়িত্ব-কর্তব্যের নিরিখেও এই বাণী খুবই প্রাসঙ্গিক ও জীবন ঘনিষ্ঠ।

'নিজের নিজ পরিবারের

ব্যষ্টিসহ পরিবেশের

পালন-পোষণ হয়ই যেন

শ্রেষ্ঠ নীতি এই জীবনের।'

কোন মানুষই একা বাঁচতে পারে না। বাঁচতে গেলেই পরিবেশের সহায়তা লাগে। তাই, সপরিবেশ বেঁচে থাকা তথা অন্যের বাঁচা-বাড়াকে আত্মবৎ বিবেচনাই ধর্ম-বিধান বলে ঠাকুর অভিহিত করেছেন।

শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বিরচিত 'মহামানবের সাগরতীরে' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পরিচ্ছেদ–৮-এ বাণীটি উদ্ধৃত করে উল্লেখ করা হয়েছে যে– শ্রীশ্রীঠাকুর ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, ১০ জুন, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে বাণীটি প্রদান করেন। অতঃপর লেখক তৃতীয় বন্ধনীর মাঝে উল্লেখ করেছেন যে– [শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত প্রার্থনা আলোচনার আষাঢ়, ১৩৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ছড়ার আকারে এই প্রার্থনা দেওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, 'আমরা যে প্রার্থনা করি, তা' আগ্রা সৎসঙ্গের। তোদের প্রার্থনা, কেমন হবে তা' আমি দিলাম। এখন প্রতি ঘরে ঘরে এই প্রার্থনা চালু হওয়া দরকার। প্রার্থনার প্রধান কথা হল energetic volition (উৎসাহদীপ্ত ইচ্ছাশক্তি) সৃষ্টি করা, যার যেখানে যা' করণীয় তা' করতে পারা]

১৩৬৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই বাণীটি প্রদানের পর পরবর্তী আষাঢ় মাসে আলোচনা পত্রিকায় তা' প্রকাশিত হয়। এরপর আরো ৯ বছর কাল শ্রীশ্রীঠাকুর স্থুলদেহে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু প্রার্থনার অঙ্গ হিসেবে বাণীটি তখন অন্তর্ভূক্ত হয়নি। দয়ালের সামনে যে প্রার্থনা হত, সেখানে আহ্বানী থেকে সপ্তার্চি পর্যন্তই উচ্চারিত হত। আর হিমাইতপুর সৎসঙ্গে প্রার্থনান্তিক ধ্যানের পর এই দীর্ঘ বাণী নিবেদন হতে দেখেছি। গোল বাঁধে বাণীটিকে মূল প্রার্থনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভূক্তি নিয়ে। পরমপুরুষের বাণী বা কথা চির-অভ্রান্ত। তাই, তাঁর দেয়া প্রার্থনাক্রমের সংকোচন বা প্রসারণ কোনটাই কাম্য নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। এ প্রসঙ্গে পূজনীয় শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় 'প্রার্থনার কথা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে–

'আহ্বানী থেকে সপ্তার্চ্চি পর্যন্ত প্রার্থনা করার পরে ধ্যান করলে সে ধ্যান কিন্তু আমাদের কাছে ঐ ভাব ও অর্থে অর্থান্বিত হয়ে উঠে না। প্রার্থনার দীপ্ত ভাষা সমূহ আমাদের অন্তরকে

ভাবদীপ্ত করে তোলে বটে কিন্তু বোধদীপ্ত করে তোলে না। তাঁর শব্দদীপ্ত ভাষার ঝঙ্কার সে-সবের নিহিতার্থের একটা আবছা-আবছা ধারণা দিলেও তাতে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠামূলক কোন চিন্তার উদ্বোধন হয় না বা ইষ্ট আর ইষ্টস্বার্থে মনের আনাগোনাও চলে না। এমন ধ্যানের পরে 'দয়াল আমার! প্রভু আমার! প্রার্থনাটি আবৃত্তি করলে তা' মনের উপর প্রভাব বিস্তারের কোন সুযোগই পায় না। নামকাওয়াস্তে করা হয় মাত্র। পক্ষান্তরে আহ্বানী থেকে সপ্তার্চ্চি পর্যন্ত প্রার্থনা করার পরে 'দয়াল আমার! প্রভু আমার!' প্রার্থনাটি আবৃত্তি করে ধ্যান করলে তা' আমাদের কাছে ধ্যানের যথার্থ ভাব ও অর্থে অর্থান্বিত হয়ে উঠে। এর সহজ সরল ভাষা আমাদের অন্তর মথিত করে বোধের একেবারে মূলে গিয়ে পৌঁছায় এবং আমাদের তঁদভাবভাবিত করে সত্তাকে সঞ্জীবিত করে তোলে। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামূলক চিন্তার উদ্বোধন হয়ে ইষ্ট আর ইষ্টস্বার্থে মনের আনাগোনা চলে অবিরাম গতিতে। ভিতরে ভিতরে তাঁর প্রতি ভাব, ভক্তি, ভালবাসা ও আকুলতার আবেগ উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে তৎপ্রীতিপ্রসূ কর্মে নিয়োজিত হতে প্রেরিত করে আমাদের।' আবার শ্রদ্ধেয় শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় সপ্তার্চ্চি পত্রিকার মাঘ/১৪১০ সংখ্যায় লিখিত এক মনোগ্রাহী প্রবন্ধে (প্রার্থনার অবতরণ) উল্লেখ করেছেন যে–'............ জাগতিকভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রা সৎসঙ্গের ভাবধারায় দীক্ষিত ছিলেন বলে সেখানকার প্রবর্তিত বিনতিতে জননীদেবীর সাথে যোগদান করেছেন। শ্রীযুত সরকার সাহেবকে তিনি গুরু বলে মানতেন। তাঁর দিক দিয়ে যা' করণীয় তা' করেছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরকে যাঁরা গুরুপদে বরণ করেছেন, সেই সৎসঙ্গীদের আদর্শ তো তিনিই। তাই, তাদের উচিত তাদের ইষ্টঠাকুরের আদেশ পালন করা, ঠাকুর প্রবর্তিত ধারায়ই উপাসনা করা। তা' করতে গিয়ে যদি কেউ বিনতির চাইতে 'প্রার্থনা' ছড়াটির গুরুত্ব বেশী মনে করে, তা' কি দোষের হয়?' দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি (দেবীদা) শ্রীকৃষ্ণভক্তদের 'ভজ শ্রীকৃষ্ণ কহ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে। যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে হয় আমার প্রাণ-রে ॥' শীর্ষক পঙক্তিদ্বয় গৌরাঙ্গ ভক্তদের নিম্নরূপে গাওয়ার উল্লেখ করেছেন। পরবর্তিত রূপটি হচ্ছে–

'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে ॥'

দেবীদা আরো উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। গৌরাঙ্গ ভক্তরা নিজ গুরুতেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে গুরু-গৌরবে গরীয়ান হয়ে কৃষ্ণস্থলে গৌরাঙ্গের জয়গান বা স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেছেন। পূর্বোক্ত নিবন্ধের শেষে দেবীদা আরো মন্তব্য করেছেন যে–'পূর্বাপর বিচার করে দেখলে, শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত প্রার্থনাই আমাদের নিত্য প্রার্থনা হওয়া উচিত। আর তা' কেবল পাঠ করা নয়, ছড়ায় কথিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুশীলন ও অনুসরণ করা চাই। তবেই প্রার্থনা আমাদের জীবনে অর্থময় হয়ে উঠবে।' উল্লিখিত পূজনীয় দুইজন বিজ্ঞ লেখকের এমন মত প্রকাশের পর হিমাইতপুর, পাবনা সৎসঙ্গের নির্বাহী পরিষদ 'সমবেত প্রার্থনা ও ঘরোয়া প্রার্থনা প্রসঙ্গে ইষ্টনির্দেশ' শিরোনামে একটা প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। (সম্ভবত ২০১১ খ্রি.) প্রচারপত্রটিতে পূজ্যপাদ শ্রীবিবেকরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর 'আমি যা' বুঝি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে– 'এই প্রবন্ধে (আমি যা বুঝি) বিবেক দা বলেন– শ্রীশ্রীঠাকুর বহু জায়গায় আহ্বানীসহ সপ্তার্চ্চি পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনা করতে বলেছেন এবং আমরাও তার সামনে তা করে চলেছি।' একই প্রচারপত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের বলা মত প্রতি ঘরে ঘরে বিশেষ প্রার্থনাটি (দয়াল আমার! প্রভু আমার!) চালু রাখা এবং সমবেত প্রার্থনায় আহ্বানী থেকে সপ্তার্চ্চি পর্যন্ত বহাল রাখার পক্ষে অভিমত দেয়া হয়েছে। তাতেই হিমাইতপুর সৎসঙ্গের সার্বিক সংহতি বজায় থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আরো উল্লেখ আছে যে– দেওঘর সৎসঙ্গ (যেখানে প্রার্থনার সংক্ষিপ্ত রূপ চালু), পূজ্যপাদ কাজলদার সংঘ, সৎসঙ্গ চার্চ, গিধনী সৎসঙ্গ, মিশন প্রভৃতি সংগঠনের প্রার্থনা গ্রন্থে কোথাও (দয়াল আমার! প্রভু আমার!)বাণীটি স্থান পায় নি।

প্রার্থনাক্রম সম্পর্কে আলোচনা পত্রিকার জানুয়ারি/৪৯ সংখ্যায় বলা হয়– প্রথমে আহ্বানী, তৎপর যথাক্রমে বিনতি, আচমন, পুরুষোত্তম বন্দনা, আচমন ব্যতীত বাংলা সমবেত প্রার্থনার অবশিষ্টাংশ যথাসম্ভব গুরুবন্দনা ও পঞ্চবর্হি ইত্যাদি। লক্ষ্য করার বিষয় যে, প্রার্থনাক্রমে পুরুষোত্তম প্রণাম (বন্দে লোকতিলকং..........) ও সপ্তার্চ্চির উল্লেখ নেই। আবার আলোচনা প্রসঙ্গের ১৫শ খণ্ডে প্রার্থনার ক্রম সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আহ্বানী, বিনতি, আচমন, পুরুষোত্তম বন্দনা, আর্য সন্ধ্যার অবশিষ্ট, গুরুবন্দনা, পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি। আলোচনা পত্রিকার জানুয়ারি/৪৯ মাসে প্রকাশিত প্রার্থনা ক্রম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এবং আলোচনা প্রসঙ্গে-১৫শ খণ্ডে প্রকাশিত প্রার্থনা-ক্রম নিয়ে বিপত্তি দেখা গেল। আলোচনা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময় (জানুয়ারি/৪৯) শ্রীশ্রীঠাকুর সশরীরে বর্তমান ছিলেন। আর, তাঁর মহাপ্রয়াণের ১৭ বছর পরে আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড প্রকাশিত হয়। পূর্বকথিত আলোচনা পত্রিকার বিজ্ঞপ্তিতে সপ্তার্চ্চি'র উল্লেখ না থাকা বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মিত্রের (আলোচনার প্রথম সম্পাদক) জিজ্ঞাসার জবাবে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রফুল্লদা ২৬/৭/৯১ খ্রি. তারিখে যে পত্র লেখেন তাতে তিনি বলেন, 'সমবেত প্রার্থনার বিধি' বিজ্ঞপ্তিটি (যা' আলোচনায় প্রকাশিত) দেওয়া হয়েছিল দয়ালের ডিকটেশন অনুযায়ী/ ওটা নির্ভুল, নিখুঁত ও নিত্যকালের জন্য করণীয়। ....আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী'। (দ্রষ্টব্যঃ পূর্ব-কথিত পূজনীয় বিদ্যুৎদার প্রবন্ধ)

'বন্দে লোকতিলকং ....' শীর্ষক পুরুষোত্তম বন্দনা বা প্রণাম শ্লোকটি আহ্বানীর পরপর পাঠ করা হয়। অথচ জানুয়ারি/৪৯

সংখ্যার আলোচনার বিজ্ঞপ্তি কিংবা আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড কোথাও এর উল্লেখ নেই, পূর্ব কথিত পূজনীয় বিদ্যুৎদার প্রবন্ধে উল্লেখ আছে যে,–'বন্দে লোকতিলকং .... বাণীটি শ্রীশ্রীঠাকুর ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে দেন এবং তখনই প্রার্থনায় আহ্বানীর পরে করণীয় হিসাবে যোগ করেন। তাই, ১৯৪৯ সালে দেওয়া প্রার্থনা ক্রমের বিজ্ঞপ্তিতে তা' থাকার কথা নয়। সেক্ষেত্রে আলোচনা-প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ডে তা' স্থান পাবার কথা। যে কোন কারণেই হোক. তা হয়নি। সপ্তার্চ্চি স্তোত্রটি শ্রীশ্রীঠাকুরের দেয়া। এই নগন্য লেখক মনে করে যে এর ভাব ও ব্যঞ্জনা অনুকূল দর্শনের মূল উপজীব্য বিষয়কে ধারণ করেছে। ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য এবং তথাগত তাঁরই বার্তাবাহী। আর বর্তমান পুরুষোত্তম হচ্ছেন পূর্ব পূর্ব পুরুষোত্তম বা তথাগতগণের অগ্রণী, পূর্বসূরীদের আপূরণকারী বিশেষ বিশিষ্ট নরবিগ্রহ। একমাত্র তাঁর অনুকূল শাসনই অনুসরণীয়। সকল তত্ত্ববিৎ, পিতৃপুরুষ ও পরলোকবাসী দেবগণ কোন ভাবেই অবহেলার যোগ্য নন, শ্রদ্ধেয়। বর্তমান পুরুষোত্তমের বর্ণাশ্রম অনুগামী সদাচার জীবন নিত্য পালনীয়। বিহিত সবর্ণ অনুলোম ক্রমিক আচারসমূহ পালনীয়, প্রতিলোম আচার স্বভাব ধ্বংসকারী বিধায় বর্জনীয়। সপ্তার্চ্চি স্তোত্রের বাংলা তরজমা মোটামুটি এমনতর। শেষে বলা হয়েছে যে, আর্য-সন্তান মাত্রেরই পঞ্চবর্হীর ন্যায় এই সপ্তার্চ্চি অনুসরণ, স্বীকার ও গ্রহণ করা কর্তব্য বলে অনুশাসন রয়েছে। পুরুষোত্তম পরম্পরা স্বীকার, সদাচার জীবন পরিচালনা, সদৃশ সবর্ণের মধ্যে সুবিবাহ এবং প্রতিলোমজ আচার বর্জনের শিক্ষাই অনুকূল মতাদর্শের প্রধান উপজীব্য বিষয় বিধায় সপ্তার্চ্চি স্তোত্র প্রার্থনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবদ্দশায় তাঁর সামনে প্রার্থনাক্রমের সাথে সংযুক্তি আকারে তা' নিবেদিত হয়েছে।

ধর্ম তো জীবন-বৃদ্ধির বিজ্ঞান। ঠাকুর যা যা বলেছেন, জীবনে তার যথার্থ বাস্তবায়ন ও চর্চা করাই ধর্মের সারকথা। সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্যই সদাচার পালন অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে বিহিত, সদৃশ সবর্ণের অনুলোমকেন্দ্রিক সুবিবাহ জীবনকে সার্থকতার শিখরে পৌঁছে দেয়। তাই, সপ্তার্চ্চির বাণীর অনুসরণ ও চর্চা প্রতিটি জীবনবৃদ্ধিকামী মানুষের জন্যই পালনীয়। এখন, আলোচনা পত্রিকার জানুয়ারি/৪৯ সংখ্যায় প্রচারিত প্রর্থনা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তির পঞ্চবর্হীর শেষে 'ইত্যাদি' এই অব্যয় পদের সুযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেয়া ভিন্ন কোন ভক্তিমূলক, ভাব-উদ্দীপক বাণীর প্রার্থনাক্রমে সংযোজন যথার্থ হতে পারে না। যদিও সপ্তার্চ্চি'র সংযোজনে তাঁর অনুমোদন ছিল এবং তাঁর সামনেই প্রার্থনায় তা' নিবেদিত হয়েছে।

আমি ঠাকুর কে ভালবাসি। কথায় কাজে সবদিক দিয়েই আমি তাঁর মানুষ হয়ে উঠতে চাই। তাঁর ভালতে বাস করতে চাই, তিনি যাতে খুশি হন, তৃপ্ত হন এমন কাজ চলন-চরিত্রে রপ্ত করতে চাই। আমাকে নিয়ে যেন তিনি নিরোগ নিরুদ্বিগ্ন থাকেন। সেই জন্যই তাঁর দেওয়া অনুশাসন যথার্থ পরিপালন একজন ভক্তের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সকাল-সন্ধ্যার প্রার্থনায় যথাসময়ে যথানিয়মে আত্মনিবেদন হওয়া তাই ভক্ত চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তাই, তাঁকে, তাঁর বাণীকে অবিকল অনুসরণ আমাদের একমাত্র দায়িত্ব। কোন অজুহাত বা যুক্তিতেই তাঁর দেয়া প্রার্থনা-ক্রমের সংযোজন-বিয়োজন কোন ভাবেই কাম্য নয়। তিনি চির-অভ্রান্ত। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী সর্বকালের জন্য নির্ভুল। তাই তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে যে প্রার্থনার পূর্ণাঙ্গ ক্রমটি মানা হত, সেটিই সর্বকালের, সর্বমনের নিকট অবশ্য পালনীয় বলেই মনে করি। এমন দিন খুব বেশী দূরে না যে, বিশ্বের সকল ঠাকুর অনুসারী মানুষ একসুরে, একলয়ে একই প্রার্থনা মন্ত্রের স্বর্গীয় মূর্চ্ছনায় মিলিত হবেন।

হিমাইতপুর সৎসঙ্গের ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রচারিত একটি প্রচার পত্রে বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করে এ নিবন্ধের ইতি টানব। ঘটনাটি নিম্নরূপ। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ সাল। সকাল ৮-৩০ মিঃ। দেওঘরে পার্লারের দরজায় শ্রীশ্রীঠাকুর বসেছিলেন। অসুস্থতার কারণে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি ছিল না সবার। প্রয়াত শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে আসছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পেছন থেকে ডাক দিয়ে তাকে কাছে নিয়ে বললেন– মনে আছে তো রে? কি মনে আছে বুঝতে না পারাতে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ থেকে বেরিয়ে এল যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে। তিনবার বলার পর গম্ভীর স্বরে বললেন– মনে থাকবিনে তো? প্রফুল্লদা সম্মতি জানালেন। আবার বলে উঠলেন– দুনিয়া একদিকে, আমি একদিকে। তুই আমার দিকে থাকবিনে তো? পুনর্বার ইংরেজীতে বলে উঠলেন– The world is on the one side and I am on the other. Will you keep in my side? প্রফুল্লদা ঠাকুরকে ভরসা দিয়ে আশ্বস্ত করলেন। কাজেই প্রার্থনা কেন্দ্রিক মতভেদ কোনভাবেই কাম্য নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবদ্দশায় তাঁর সামনে নিবেদিত প্রার্থনা-ক্রম সর্বতোভাবে মেনে চলা বর্তমান ও ভবিষ্যতের সৎসঙ্গীদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্ম। প্রতিকূল প্রশ্ন, যুক্তি উপেক্ষা করে তাঁর ব্রত পালনই হোক আমাদের একমাত্র তপস্যা। দুনিয়ার সবাই ভিন্ন কথা, ভিন্ন যুক্তিতে উপস্থাপন করলেও আমাদেরকে অবিচল নিষ্ঠায় তাঁর বলা মাফিক প্রার্থনা-ক্রম অনুসরণ করতে হবে। তখনই শুধু আমাদের বলা সার্থক হবে, দয়াল! আমি তোমাকে সত্যিই ভলিবাসি।

বাংলা ১৩১৬ সালে ভক্তের আকূল আবেদনে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে স্বর্গের পূতঃ মন্দাকিনী ধারা। জগদ্‌গুরু পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত দিব্যবাণী আত্মপ্রকাশ করে এই হিমাইতপুর আশ্রমেই– যা'র নাম 'সত্যানুসরণ'; যা' অনন্তকাল ধ'রে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই প্রেরণা যোগাবে।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও পুণ্যতীর্থ পাবনা হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রম

ড. প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত

বাংলা ১৩২০ সালের পর থেকেই হিমাইতপুর আশ্রমেই তাঁর এই বাণীগুলো ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রতে থাকে। ১৩২৫ সালে কুষ্টিয়ায় বিশ্বগুরু মহোৎসব হয়। বিশ্বগুরু আবির্ভাব মহোৎসবের পর থেকেই স্টীমারে ক'রে অগণিত ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে হিমাইতপুর আসতে আরম্ভ করেন। স্থায়ী ভক্ত সংখ্যা আশ্রমে ক্রমশঃ বাড়তে শুরু করে। হিমাইতপুর আশ্রমকেই লোকে বলতে শুরু করে পাবনার 'সৎসঙ্গ' প্রতিষ্ঠান বা 'শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আশ্রম'। শ্রীশ্রীমা (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতা মনোমোহিনী দেবী) ছিলেন আগ্রা দয়ালবাগের সৎসঙ্গী। তিনি এই আশ্রমেরও নামকরণ করলেন 'সৎসঙ্গ' আশ্রম এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণকে সৎসঙ্গী বলে অভিহিত করলেন। এইভাবে পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রম ও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। হিমাইতপুর আশ্রমে যে মধুচক্র গড়ে ওঠে তা'তে কিশোরীমোহন, অনন্তনাথ রায়, সতীশচন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ লীলাপার্ষদদের অবদান অবিসংবাদিত। বৈষ্ণব কিশোরীমোহনের বাড়ীতেই হ'ত নিত্য কীর্তনবিলাস। সকলে সম্মিলিত হ'য়ে মহানন্দে কীর্তন করতেন। সঙ্কীর্তনচক্রের স্রষ্টা এবং প্রাণকেন্দ্র ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। খোলকরতাল নিয়ে প্রথমে কীর্তন শুরু করা হয়েছিল। তারপর তিনি জয়ঢাকের প্রবর্তন করেন। কোকনের জয়ঢাক, তরণীর করতাল, যতীশ ঘোষের ভাবতন্ময়তা, কিশোরীমোহনের হুঙ্কার এবং শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দিব্যোন্মাদনার দ্বারা এক অনুপম ভাবরাজ্যের সৃষ্টি হ'ত- এ-দৃশ্য অনুভব সাপেক্ষ, ভাষায় বর্ণনা করা কোনও প্রকারেই সম্ভব নয়।

হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমের প্রাণপুরুষ কিরূপ ভক্ত-বৎসল ছিলেন তাঁর উক্তিই তার সাক্ষ্য বহন করে- 'প্রথমেই যা'রা গ্রহণ করেছিল তা'রা মাত্র ছিল দুইজন -সে একজন আমার কৈশোরের ছিল খেলার সাথী-আমার অনন্ত মহারাজ, আর একজন কিশোরীমোহন দাস।' (-তাঁর চিঠি, ১০৪)

কিশোরীমোহনের মনে প্রশ্ন জাগে-'গোসাঁইয়ের (আচার্য সতীশচন্দ্র গোস্বামী) জন্য (ঠাকুর) এত ব্যস্ত কেন? অদ্বৈতবংশের সন্তান -সেই কি অদ্বৈতপ্রভু?

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠে ভাবাবস্থায় উচ্চারিত হ'ল- 'হাঁ, হাঁ, তাই। অদ্বৈত মহাপ্রভু। ও ঝাঁপ দিলে প্রকৃত প্রচার আরম্ভ।' মাতৃভক্ত বালক শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনে মায়ের ভূমিকা ছিল সূর্যের মত সত্য, সমুদ্রের মত গভীর এবং ধ্রুবতারার মত অবিচল। ঠাকুর বলতেন-'ভগবান্ অবধিও যদি হয়ে উঠতে হয় তাও হয়ে উঠবো-সেটা মা-র খুশীর জন্য, তৃপ্তির জন্য।' এরূপ মাতৃভক্ত বালক এবং মায়ের টানেই তদানীন্তন প্রখ্যাতনামা মনীষীবৃন্দ হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রম পরিদর্শনার্থে এসেছিলেন। এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাবা জানকীনাথ বসু, মা প্রভাবতী দেবী এবং আরও অনেকে।

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মঙ্গলময়, সৎসঙ্গ আন্দোলনের প্রারম্ভে সেবা ও সাহচর্যে দীপ্তিমান যে পঞ্চমানবেব সৃষ্টি করেন- তা'রা হ'লেন মহারাজ অনন্তনাথ রায়, ভক্তবীর কিশোরীমোহন, গোস্বমী সতীশচন্দ্র, ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং কর্মবীর সুশীলচন্দ্র বসু। আরও যাঁরা ছিলেন বা আছেন তাঁরাও সৎসঙ্গের ইতিহাসে স্বীয় ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশমান থাকবেন।

দেখতে দেখতে ঠাকুরের অপূর্ব কর্মনৈপুণ্যে হিমাইতপুরে গড়ে ওঠে তপোবন বিদ্যালয়, বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র, সৎসঙ্গ কেমিকেল ওয়ার্কস্, সৎসঙ্গ পাওয়ার হাউস, সৎসঙ্গ প্রেস, সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস, সৎসঙ্গ মহিলা সমিতি, সৎসঙ্গ ধাত্রী বিদ্যালয়, সৎসঙ্গ দাতব্য চিকিৎসালয়, সৎসঙ্গ কলানিলয়, সৎসঙ্গ ব্যাঙ্ক, সৎসঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ইত্যাদি। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে সৎসঙ্গ আশ্রম অপূর্বশ্রী ধারণ করেছিল।

হিমাইতপুর আশ্রমের প্রাকৃতিক শোভা ছিল মনোরম এবং বৈচিত্রপূর্ণ। ১৯৩০ সালের কথা- আশ্রমের সামনে ছিল প্রকাণ্ড খোলা প্রাঙ্গণ। নিচেই পদ্মা। তার ধারেই ছিল উঁচু বাঁধ। বাঁধের গায়ে ছিল পদ্মায় নামবার সিঁড়ি। শীতকালে নদী শুকিয়ে বহুদূর চলে যেত। বর্ষার জল উপচে উঠে উঠে বাঁধের কিনারায় লাগত। ঝড় উঠলে ঢেউগুলো বাঁধের গায়ে আছাড়

খেয়ে পড়ত আর স্রোতের জলে প্রাঙ্গণ ভেসে যেত । নদীতে নানা রং-এর পাল তুলে ছোট বড় কত নৌকা যেত-আসত, জেলেরা আনন্দে মাছ ধরত, মাঝে মাঝে সশব্দে স্টিমার যেত । তখন আশ্রমের দৃশ্যটা সত্যই খুব মনোমুগ্ধকর হত । বাঁধের দুধার ছিল দু'টো চওড়া লম্বা বেদী । বেদীতে বসে লোকজন গল্পগুজব করত, আর পদ্মার অপরূপ শোভা দেখত । বিকেল বেলায় পদ্মার ধারে লোকজনের ভিড় বাড়ত । প্রাঙ্গণের শেষে দু'দিকে ছিল দুটো কটেজ । একটাতে শ্রীশ্রীমা (মাতা মনোমোহিনী দেবী) থাকতেন । মাঝখানে ছিল প্রকাণ্ড একটা দালান । এরই নাম পরবর্তীকালে 'মাতৃমন্দির' হয়েছিল । প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এখানে সৎসঙ্গ হ'ত । আশ্রম-প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে বাঁধের কাছে একটা নিম গাছের নিচে শ্রীশ্রীমার গুরুদেবের মন্দির ছিল মন্দিরে অনেকগুলো সিঁড়ি ছিল । মন্দিরের কাছে উত্তরদিকে ছিল আনন্দবাজার আঙিনা । শ্রীশ্রীমার কটেজের পিছনেও ছিল একটা বড় প্রাঙ্গণ । তার পশ্চিম দিকে ছনের ঘরে লোকজন থাকত, উত্তরদিকে ছিল ডাক্তারখানা ও লাইব্রেরী ঘর ।

লাইব্রেরী ঘরের পাশ থেকে বাড়ীর ভিতর যাবার রাস্তা ছিল । তার কাছেই ছিল একটা বড় ছনের ঘর, মাটিতে উঁচু ভিত ও মেঝে গোবর মাটি দিয়ে লেপা, তকতকে এবং ঝক্‌ঝকে থাকত । এই ঘরেই থাকতেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও মহারাজ । প্রতিদিন সকালে ও বিকালে শ্রীশ্রীমার কটেজের বারান্দায় তক্তপোষের উপর শ্রীশ্রীমার কোলে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর বিনতি প্রার্থনা করতেন । আশমের আবালবৃদ্ধবনিতা সেই প্রার্থনায় যোগ দিতেন ।

হিমাইতপুর আশ্রমের ঐতিহ্যবাহী পুণ্যভূমি আজও বিদ্যমান । পদ্মা প্রবহমানা । তাঁরই পুণ্যভূমি জন্মভূমি জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকরূপে চিরসমাদৃত হ'য়ে থাকা একান্ত প্রয়োজন এবং থাকবেও এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের উক্তিটি লক্ষ্যণীয় ঃ

...'আমরা দেখতে পাই মহাপুরুষেরা যেখানে যা' করেছেন তার পিছনে ছিল তাঁ'তে integrated(সংহত) বিরাট দল, – কেষ্ট ঠাকুরের ছিল integrated (সংহত) বিরাট দল, রসুলের ছিল তাই । আর, আজও কেউ থাকেন যিনি বোঝেন সকলের ব্যথা, যিনি দরদী, যিনি adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে তুলতে পারেন প্রত্যেককে বাঁচার পথে এবং তাঁতে যদি বহুজন ভালোবাসায় intergrated (সংহত) হয়–তবেই হয় । 'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি,' পতাকাটা আর কিছু নয়,ঐ প্রেম– অচ্যুত ভালবাসা । পতাকা পড়ে গেল মানে–চ্যুতি আসলো তখন আর চলতে পারবে না ।' (আলোচনা প্রসঙ্গে, ১২/১৬৮)

কালের আবর্তে জগন্নাথের রথ থেমে থাকবে না– অনন্তকাল ধ'রে চলবে । তিনি বলেছেন–'বাবা-মা, গুরুর' প্রতি উদগ্র টান থাকলে তা'র পা বেতালে পড়ে না– সে কখনও প্রবৃত্তির দাস হয় না । সমস্ত star (তারা) pole star (ধ্রুব তারা) এর দিকে মুখ ক'রে ঘুরছে; তাই কক্ষচ্যুত হয় না । সর্বত্র ঐ একই কথা ।'

জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জগ্‌দগুরু শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেছেন–

'আমাদের গন্তব্য হ'ল-ঈশ্বরপ্রাপ্তি–
ধারণ-পালন-সম্বেগসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব,
তা'র উপায় হচ্ছে আচার্যে সক্রিয় অনুরতি
তা'র থেকে আসে-আত্মনিয়ন্ত্রণ,
পরিবার-নিয়ন্ত্রণ, সমাজ-নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ,
আর এই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে
সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা ক'রে
সবটা নিয়ে বিবর্দ্ধনের দিকে এগিয়ে চলা,
আর, প্রাপ্তির পরম বেদনা এই–ই ।'

অন্তরের ষোল-আনা টান আদর্শে কেন্দ্রায়িত করতে গেলে কতকগুলো বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন করতে হয় । শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলোকে মেনে নেওয়ার রীতিকেই বলে দীক্ষাগ্রহণ । দীক্ষার পর নিষ্ঠা-সহকারে সেই নীতি-বিধিগুলো প্রত্যহ প্রতিপালন করবার জন্য বিশেষভাবে তৎপর হওয়া চাই । তবেই আমাদের আদর্শের প্রতি অনুরাগ ক্রমশঃ বেড়ে যাবে । তাঁর ভাবে ভাবিত এবং অনুরঞ্জিত থাকার ফলে আমাদের চরিত্রেও আসবে আমূল পরিবর্তন । মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য দীক্ষা সম্পর্কিত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণীত্রয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

'সৎদীক্ষা তুই এক্ষুণি নে
ইষ্টেতে রাখ সম্প্রীতি,
মরণ তরণ এ নাম জপে
কাটেই অকাল যমভীতি ।'

–অনুশ্রুতি, ১ম, সাধনা-১৭ ।

'দীক্ষা নিয়ে নিয়মমত
চল্লে তবে হয় উন্নত ।'
—অনুশ্রুতি, ১ম, সাধনা-৫০ ।

'বস্তু হারা গুণ যেমন
ভাবতে পারা যায় না
ব্রহ্মবিদ্ বিনেও তেমনি
ব্রহ্ম পাওয়া যায় না ।'
অনুশ্রুতি, সাধনা-৪২ ।

যে যে-প্রকৃতিরই হ'ক না কেন, সে যদি আগ্রহের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যথাবিধি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচার পালন করে চলে, তবে তার ভিতরে ইষ্টনিষ্ঠা ও ইষ্টানুরাগ ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠবেই—এটা হ'ল মনোবৈজ্ঞানিক সত্য । নাম-ধ্যানের দ্বারা বিধৃত হ'য়ে তাঁর পূজার নৈবেদ্য সাজালে তাঁর প্রেমের পরশ পাওয়া যাবেই—কোন বাধাই আমাদের পথচলার অন্তরায় হ'তে পারবে না । তাই ত যুগ পুরুষোত্তম বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেন—

'সৎ যদি হয় সঙ্গ তোমার
ভাব যদি হয় মহান উচ্চ
বিশ্বের দ্বারে সাধনা তোমার
হবে না তুচ্ছ, হবে না ব্যর্থ ।'

আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মহাভাবাবস্থায় যা' বললেন তা' বিশেষভাবে অনুধ্যান বা অনুধাবনযোগ্য—

'যখন তোরা সেই ব্রজলীলায় নিত্যরাসে মাতিস্, তখন আমি প্রতি ঘটে-ঘটে শ্রীকৃষ্ণ । আবার যখন তোরা নদীয়ার পথে-ঘাটে-বাটে হরিবোল হরিবোল ব'লে প্রেমে উন্মাদ হ'য়ে নৃত্য করিস্, তখন সর্ব্বঘটে আমি শ্রীচৈতন্যরূপে চৈতন্য দান করি, আমি আবার প্রেমময় রূপে সর্ব্বঘটে প্রেম দান করি । আমি নিত্য সাক্ষী-স্বরূপ,আমিই শ্রীকৃষ্ণ, আমিই শ্রীচৈতন্য, আমিই রামকৃষ্ণ, আমিই সব, আমিই সব ।'
—পুণ্যপুঁথি, ৬৬/৫

পরমপিতা ছিলেন, আছেন এবং অনন্তকাল আমাদের মধ্যে থাকবেন ।

ইষ্টগুরুই যে পুরুষোত্তম তাঁরই প্রদত্ত বাণীটি তার সাক্ষ্য বহন করে—

'ইষ্টগুরু পুরুষোত্তম
প্রতীক গুরু-বংশধর,
রেতঃ-শরীরে সুপ্ত থাকে
জ্যান্ত তিনি নিরন্তর ।'

একমাত্র সেই দেখতে পায়, যা'র দেখার মত চোখ আছে; সে-ই শুনতে পায়, যা'র শোনার মত কান আছে । তাই বিশ্বকবির সুরে সুর মিলিয়ে তাঁর রাতুল চরণে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা—

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো ।
ডাকিছে মেঘ, হাকিছে হাওয়া—
সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষঘন কালো ।
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো ।'
গীতাঞ্জলি, পৃষ্ঠা-৩৪ ।

সন্দীপনায় যে কোন লেখা পাঠাতে এই মেইল নাম্বারগুলোতে পাঠান—

E-mail: tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

শিশুর জন্ম ও সংস্কার

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শিশুদের উদ্দেশ্য করে কবি লিখলেন, "ইহাদের করো আশীর্ব্বাদ ।" আমাদের ঘরে ছোটরা যখন গুরুজনদের প্রণাম করে তখন গুরুজনরা তাদেও মাথায় হাত ঠেকিয়ে আশীর্ব্বাদ করেন । কেউ-কেউ শুভ কামনা ক'রে বলেন 'মঙ্গল হোক' বা দীর্ঘজীবী হও' । এইভাবেই আমাদের আশীর্ব্বাদের কাজ শেষ হয় । তারপর ঐ শিশুটি ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যেতে-যেতে যখন হঠাৎ গাড়ী চাপা প'ড়ে বিকলাঙ্গ হয় বা প্রাণ হারায়, তখন দেখি গুরুজনদের ঐ আশীর্ব্বাদ তাকে রক্ষা করতে পারল না । আবার এমনও ঘটে যে, বয়স্ক হওয়ার সাথে-সাথে ঐ শিশু দুষ্ট সঙ্গীসাথীর পাল্লায় পড়ে একেবারে ব'য়ে গেল । কাউকে মানে না, বড়দের শ্রদ্ধা করে না, উচ্ছৃঙ্খল চলনায় চলে । যে গুরুজন ছোটবেলায় তার মাথায় হাত দিয়ে স্নেহভরে আশীর্ব্বাদ করতেন, তিনিই এখন ওকে দেখে মুখে বিরক্তির ভ্রুকুটি এনে বলেন 'ছেলেটা একেবারে জাহান্নামে গেছে' । অথবা, ছোটবেলায় গুরুজনদের বহু-আশীর্ব্বাদপুষ্ট ছেলেটি বড় হ'য়ে সংসারযুদ্ধে কিছুতেই জয়ী হ'তে পারছে না । পদে-পদে ঠকে যাচ্ছে । যা' ধরে তাতেই অকৃতকার্য্য হচ্ছে । এইভাবে ভাগ্যের হাতে মার খেতে-খেতে সে হয়ে ওঠে একটা হতাশাগ্রস্ত দৈন্য-ব্যাধিপীড়িত জীববিশেষ ।

কেন এমনটা হয় তা' কি আমরা ভেবে দেখেছি? এইটুকু বলা যায়, গুরুজনের আশীর্ব্বাদের যদি কোন মূল্য থাকে তাহলে হয় আশীর্ব্বাদ কার্য্যকরী হয়নি, নতুবা আশীর্ব্বাদই করা হয়নি । আমরা বলি, শেষের কথাটাই ঠিক । কারণ, প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা সমবিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে । আশীর্ব্বাদ করা হয়ে থাকলে তার একটা ফল আছে । তাহলে আশীর্ব্বাদ করাটা কেমন?

আশীর্ব্বাদের মধ্যে আছে শাস্-ধাতু, অর্থ অনুশাসিত করা । তাই, আশীর্ব্বাদ মানে অনুশাসনবাদ । শুধুমাত্র মাথায় হাত ছোঁয়ানো বা মুখে-মুখে মঙ্গলকামনা করা নয় । যে অনুশাসনে অর্থাৎ নীতিতে চললে শিশু মঙ্গলের অধিকারী হয়ে উঠতে পারবে, সেইমত চলতে শিখিয়ে দেওয়াই প্রকৃত আশীর্ব্বাদ করা । এই চলন হ'ল, সে যাতে মাকে ভালবাসে, বাবার প্রতি ভক্তিমান হয়, প্রতিপ্রত্যেকের সাথে সদ্ব্যবহার করে, বিপদে বুদ্ধি না হারায়, কথা দিয়ে কথা রাখে, কারো কোন ক্ষতির চিন্তা না করে, সব সময় বিশেষতঃ খাওয়ার ব্যাপারে সদাচারের নিয়মনীতিগুলি নিষ্ঠার সাথে মেনে চলে, তার নিজের জিনিষপত্র যেন গুছিয়ে রাখার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়, মানুষ বিপদে পড়লে যথাসাধ্য সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, অতিথি অভ্যাগতের প্রতি সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে শেখে, ইত্যাদি । এই চলনে শিশুকে সুশিক্ষিত করে দেওয়াই হল যথার্থ আশীর্ব্বাদ করা । এই শিক্ষা চরিত্রগত থাকলে মানুষ বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও কখনও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে না, বিপৎকালে হতবুদ্ধি হয় না, কোন ঘাতপ্রতিঘাতেই ভেঙ্গে পড়ে না । আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের যে আমরা একেবারে, এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করি না তা' নয় । কিন্তু সে শিক্ষা শুরু করি তাদের ৪/৫ বা ৫/৭ বছর বয়স থেকে । কিন্তু শিশু-মনস্তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা বলেন 'একটি শিশুর শিক্ষা শুরু হয়ে যায় তার জন্মের কুড়ি বছর আগে ।' কুড়ি বছর বয়সে যে মেয়েটির প্রথম ছেলে হ'ল, সেই মেয়েটি যখন জন্মগ্রহণ করেছিল তখন থেকেই তার ঐ অনাগত সন্তানের শিক্ষা শুরু হয়ে যায় । অর্থাৎ মেয়েটি যেমন ঝোঁক, রোখ, সুসঙ্গতিপূর্ণ অভ্যাস, চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠবে, ভবিষ্যৎকালে তার ঐ ঐ গুণে ভূষিত হবার সম্ভাব্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে । এ একেবারে মাপা 'ফর্মুলা' । তাইতো মায়ের নাম 'মা' । কারণ, সে মেপে দেয় তার সন্তানকে । কথায় বলে 'যেমনি মা তেমনি ছা' । তাই মায়ের জীবন যত সুনিয়ন্ত্রিত, সন্তানের জীবনও তত সুন্দর ও সুগঠিত । দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী হয়েও শুধু নিজ গুণে সতী কয়াধু ভক্ত প্রহ্লাদের মত ছেলের জন্ম দিতে পেরেছিলেন । সাময়িক স্খলনদোষে দুষ্ট হলেও অন্তর-আবেগ সৎমুখী থাকার জন্য মাতা জবালা ঋষি সত্যকামের মত খ্যাতনামা সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন । দাসী মাতার গর্ভেও ভারতসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয় । সমাজে, সংসারে, ইতিহাসের পাতায় এ-জাতীয় উদাহরণ বিরল নয় ।

বাবা যেমনই হোক, মা ভা'ল হ'লে সন্তান ভাল হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা নব্বই ভাগ । প্রতিটি সুস্থ পুরুষের মধ্যেই থাকে সৃষ্টির বিচিত্র ধরণের বীজ । আর বিজ্ঞান বলে, তার একটি বীজের মধ্যে থাকে অনন্ত সম্ভাব্যতা । এখন, নারী

তার স্বামীর কাছে যেমন প্রেরণার সাড়া দিয়ে যেমন ধরণের বীজটি গর্ভে টেনে নেবে, তার গর্ভে আসবে তেমনতর গুণ-যুক্ত সন্তান। এ যেন এক বিরাট জলাশয়ে ছোট-বড় বহু রকমের মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেমন ধরণের টোপ ও বড়শী ফেলা হবে, সেইরকমই ছোট বা বড় মাছ বড়শীতে গেঁথে উঠে আসবে। এ কৃতিত্ব নিতান্তভাবেই মায়ের। তাই, মায়ের শিক্ষা ও সংস্কারের পরিশুদ্ধিও প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তা' একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। মা তার স্বামীর প্রতি যেমন, সন্তানটিও তেমনি আসবে। এইভাবে শিশুর জন্ম যদি শুদ্ধ ও সুন্দর করে তোলা যায়, তখন তাকে সুশিক্ষা দিলে সেটা তার মাথায় ধরে। নতুবা, মায়ের অন্তরের কুভাব অথবা বিদ্বেষ অথবা অনীহা থেকে যে শিশুর জন্ম, তাকে সুশিক্ষা দিতে গেলে তা' পিছলে যায়। ঘরের থেকে তাকে ফিটফাট জামাকাপড় পরিয়ে দিলেও বাইরে যেয়েই সে ধূলোকাদা মেখে আসবে বা জামাকাপড় ছিঁড়ে আনবে। তাই, জন্ম ভাল হ'লে, ভাল শিক্ষা তখন শিশুর মস্তিষ্কে আপনা থেকেই ধ'রে যায়।

আজ যে শিশুটি জন্ম নিচ্ছে, সে-ই হবে ভবিষ্যতে একজন নাগরিক। তার হাতে থাকবে হয়তো শিক্ষাব্যবস্থা বা শাসনব্যবস্থা বা অন্য কিছুর ভার। সে যদি ভাল না হয় তবে তার কাজের মধ্যেও ত্রুটি থাকবে। কারণ, একটি মানুষ অন্তরে ও চরিত্রে যেমনতর, তার কথা, কাজ ও লেখার মধ্যে সে ঐ ছাপই দিতে পারে মাত্র। তার চরিত্রে যদি অসঙ্গতি থাকে, জীবন যদি অনিয়ন্ত্রিত হয় তবে তার কথা ও কাজেও সেই অসঙ্গতি ও অনিয়ন্ত্রণ ফুটে বেরোবে। আর তা, সমাজে ও সংসারে আনবে নানাধরণের অশান্তি। সেইজন্য, দুর্নীতিমুক্ত সুন্দর সমাজ গঠন করতে হ'লে চাই শিষ্ট শুভসংস্কারবাহী সন্তান।

দিকে-দিকে পালিত হ'য়ে গেল আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য কতরকম পরিকল্পনার কথা শোনা গেল পত্রপত্রিকা ও আকাশবাণী মারফত। ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, সাহস, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণবিকাশের জন্য কতরকম বাণী ও উপদেশ বিতরিত হ'ল। শিশুদের বিশেষ বিশেষ গুণ ও যোগ্যতা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়ে পুরস্কার দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারা যাতে কোনভাবে অবহেলিত না হয়, পুষ্টিকর আহার এবং উত্তম পরিবেশ পায় তার জন্য কতভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও শোনা যায়নি, শুভ সংস্কার নিয়ে কিভাবে সন্তান জন্মাতে পারে তার পরিকল্পনা।

মানুষের জীবনে সংস্কার আছে দুইরকম। একটি জন্মগত সংস্কার বা সহজাত সংস্কার (born instinct)। দ্বিতীয়টি হ'ল পারিপার্শ্বিক থেকে আহৃত সংস্কার (environmental instinct)। জীবনের বিকাশে এই দুটি সংস্কারেরই অবদান ও প্রভাব অপরিসীম। জন্মগত সংস্কার যার বিশুদ্ধ, সে পারিপার্শ্বিক থেকে যা' আহরণ করে তা হয় ঐ বিশুদ্ধ ভাবেরই পরিপোষণী। পরিবেশের মধ্যে খারাপও আছে, ভালও আছে। যে-ছেলের জন্মগত সংস্কার শুভ, সে পরিবেশের ভিতর থেকে চুম্বকের মত ভালটাকেই গ্রহণ করে, খারাপটা বর্জ্জন করে। খারাপ কিছু দেখলে-শুনলেও তাতে তার মন বসে না। কোন প্রবল দুষ্ট পরিস্থিতির চাপে প'ড়ে যদি সে কখনও কোন অন্যায় ক'রেও বসে তবে তা' তার সত্তাকে স্পর্শ করতে পারে না এবং ঐ অসৎ-এর ছোঁয়াচ থেকে ফিরে আসতে তার সময়ও লাগে না। পাঁকের কাছে গেলে গায়ে কাদা লাগতেই পারে। কিন্তু সে কাদা ধুয়ে ফেলতে ঐ ছেলের দেরী হয় না।

আর, জন্মগত সংস্কার যার বিশুদ্ধ নয়, অর্থাৎ হীনম্মন্যতা, ঘৃণা, কপটতা ইত্যাদি দুর্গুণের ভিতর থেকে যে-শিশুর জন্ম হয়েছে, পরিবেশের ভাল কিছু দেখলেও তার পক্ষে তা' নেওয়া কঠিন। তার মনের বাঁক যেদিকে, সেইদিকে বাঁকিয়েই সে সব-কিছু বোঝে। শ্রেয়জনকে শ্রদ্ধা করা তার পক্ষে হয়তো একটা অপমানজনক কাজ ব'লে মনে হয়। গুণের সহজ প্রশংসাকে সে মনে করে খোশামোদ। কোন মা যদি তাকে বিশেষ স্নেহ করেন, সে ভেবে নেয় ঐ মা বুঝি তার উপর কামভাবে আসক্ত। এইরকম সব আর কি! সেইজন্য জন্মসংস্কার যার শুদ্ধ থাকে, তাকেই ভাল পরিবেশে রেখে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করলে তার উন্নতি হ'তে পারে। তা' না হ'লে মাটি দিয়ে সোনার কলসী গড়া যায় না। বিসমিল্লায় গলদ থাকলে হাজার সৎ-উপদেশ ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা কোন কাজে আসে না। সাময়িক একটা প্রলেপ দেওয়া যেতে পারে মাত্র। কিন্তু তাতে চরিত্রের স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটানো যায় না। চৌর্য্যবৃত্তির সংস্কার থেকে জাত কোন ছেলে বহু লেখাপড়া শিখে একজন ধোপদুরস্ত শিক্ষিত চোর হ'তে পারে মাত্র। তার চুরি হয়তো হবে খুব মার্জ্জিতভাবে এবং বিশেষ কৌশলে। এই কারণেই প্রাচীনকালে ঋষির আশ্রমে

(বিশ্ববিদ্যালয়ে) সংস্কার, ঝোঁক, রোখ বিচার ক'রে শিষ্য বা ছাত্র নেওয়া হ'ত। ঐ সংস্কার-অনুপাতিকই তারা শিক্ষা পেত। তার ভিতর-দিয়ে ঘটত তাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ ও শ্রীবৃদ্ধি। এই কারণেই অশুভ সংস্কারের বহু ছেলের উচ্চশিক্ষা-লাভ নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, উচ্চশিক্ষা লাভ করলে তার ঐ অশুভ সংস্কারই বেড়ে যাবে এবং তা' আরো বৃহত্তরভাবে ক্ষতিসাধন করবে।

তাই বলি, শিশুর ভাল শিক্ষার আগে থাকা চাই জন্মটা ভাল হবার ব্যবস্থা। এদিকে যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টি না আসছে ততক্ষণ সাময়িক একটা আন্দোলন সৃষ্টি ক'রে শিশুদের প্রকৃত মঙ্গল করা যাবে না। সাময়িক মাদকতা আনা যেতে পারে মাত্র। স্থায়ী পরিবর্ত্তন কিছু হয় না। সুসন্তান পেতে হ'লে চাই ভাল মা-বাবা, তাদের উন্নত মানসিকতা, ছোটখাট বিষয়েও নিখুঁত চলন, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধাভক্তি, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর স্নেহ-মমতা এবং এই উভয়েরই আবার অচ্যুত আচার্য্যনিষ্ঠ। এমনতর আবহাওয়াই সুসন্তানের আবির্ভাব সম্ভব ক'রে তোলে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিশুর জীবন সুন্দর ও সুষ্ঠু ক'রে গ'ড়ে তুলতে হলে ঘরের শিক্ষা হওয়া চাই শিষ্ট ও মনোবিজ্ঞানভিত্তিক। কারণ, ঘর থেকেই শুরু হয় শিশুর শিক্ষা। আর, গৃহগুলি প্রকৃত শিক্ষালয় ক'রে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব প্রধানতঃ মা-বাবার। পাঁচ সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর মনটা থাকে নরম কাদার মত। সেই সময় তার মনে যেমন ছাপ পড়বে, বয়স বেশী হ'লে সেইগুলিই পাকা হ'য়ে গেঁথে তার জীবন পরিচালিত করবে। ঐ বয়সে সে যেমনভাবে ভাবতে, বুঝতে ও দেখতে শেখে, তাই-ই তার চরিত্রে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে। পরবর্ত্তী জীবনে তার আচার ব্যবহারও ঐভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। আর, এই শিক্ষা যদি তার পূর্ব্বজন্মার্জিত সংস্কারের পরিপোষণী হয় তখন শিশু যেন তার নিজের জায়গাটিতে দাঁড়াতে পারে। দাঁড়িয়ে বাড়তে পারে অতি সহজেই। আর, সংস্কারকে পোষণ করে না যে- শিক্ষা, তা' তার নিজস্ব লাইনে পড়ে না। জোর ক'রে শিখতে হয়। ফলে, তা' তার চরিত্রে ও আচরণে অনেক সময় বিক্ষোভ সৃষ্টি করে থাকে।

সম্যকপ্রকারে ক'রে ক'রে যা' অর্জ্জন করা হয় তাই সংস্কার। বহুকাল ধ'রে এই করার অভ্যাসটা চলতে থাকে ব'লে তা' সত্তাগত হ'য়ে পড়ে। কোন শিশুর মাথাই কিন্তু একবারে শূন্য থাকে না। তার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিত সংস্কারের সমস্ত ছাপ মস্তিষ্কে মজুত হ'য়ে থাকে। তাই নিয়েই একটা শিশু জন্মগ্রহণ করে। পাঁচ-সাত বছর বয়সের মধ্যেই ঐ সংস্কারের প্রধান দিকগুলি মাথা চাড়া দিয়ে থাকে। তখন খুব খেয়াল ক'রে শুভ সংস্কারের রশ্মিরেখাগুলি ধ'রে ধ'রে যদি শিশুকে মানুষ করা যায়, তার বিশেষ ঝোঁকের পথে এগোতে যদি তাকে সাহায্য করা যায়, তাহলে ঐ শিশুটি ভবিষ্যতে একদিন একটি মহান লোক হ'য়ে উঠতে পারে।

যত দিন না সর্ব্বতোভাবে
প্রিয়স্বার্থী হ'য়ে উঠতে পারছ—
মান, অভিমান আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে বিসর্জন দিয়ে,
উপচয়ী-অনুচর্যী অভিদীপনা নিয়ে,-
ঠিক জেনো-
দুঃখেও সুখী হ'তে পারবে না,
সুখেও সুখী হ'তে পারবে না,
জীবনকে সুখী করার তুকই
ঐ অমনতর প্রিয়ার্থপরায়ণতা

—শ্রীশ্রীঠাকুর,
প্রীতি-বিনায়ক, বাণী ২০২।

প্রেমল ঠাকুর

শ্রীপ্রলয় মজুমদার

আমার মায়ের সাথে কিন্তু কোনদিনই ঠাকুর ঠিক তেমন করে কোন কথা বলেননি–যাতে আমার মায়ের অন্ততঃ মনে হতে পারে যে, ঠাকুর আমার মাকে ভালোমতোই চেনেন। তেমন চেনা বা জানার মতো কোনও মুহূর্তই ছিল না আমার মায়ের জীবনে।

দেওঘরে তখন আমাদের নিজস্ব দোতলা বাড়ী। আমরা রীতিমতোই বেশ ভালোভাবেই বাস করি। ঠাকুরবাড়ী নিয়মিত যাতায়াত হচ্ছে। সকালে আশ্রমের সেই পার্লার ঘরের 'খুকীর চৌকিতে' মাঝে মাঝে ঠাকুর তখন নিয়মিত বসছেন। সব মায়েরা মেয়েরা সকলেই ভিড় করে থাকছেন। ঠাকুর সকলের সাথেই কথাবার্তা বলছেন।

আমার মা বসে থাকতেন ঠাকুরের সামনেই। কোন কোনদিন এমনও হয়েছে যে, আমার মায়েরই সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে অনেককেই ঠাকুর কিন্তু তাদের নাম ধরে অথবা তাদের স্বামী বা পুত্রের পরিচয়ে ডাক দিয়ে দিয়েই কথা বলছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন কতো কিছুই। সংসারের খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ের সাথেই রান্না করার সংবাদও। কী কী রান্না হলো, কী কী সেই রান্নাতে দেওয়া হলো–থেকে শুরু করে বাড়ীতে কার কেমন কী পছন্দ, আর তার জোগান কেমন ও কিভাবেই করা হয়ে থাকে–সবিস্তার বিবরণ শুনতেন ঠাকুর খুব মন দিয়েই।
সময়ে সময়ে প্রয়োজনে পরামর্শও দিতেন ঠাকুর কোন কাজ বা বিষয়কে সংশোধন করিয়ে দিতেই।

ঠাকুরের সামনে বসেই আমার মায়ের মনে হতো, এইবারই হয়তো বা ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। জানতে চাইবেন সকলের মতো করেই সংসারে রান্নার সংবাদ। অথবা আমার স্বামীর পছন্দ অপছন্দ কী, কিংবা আমার স্বামীর কোন রকম কিছু সংবাদ এলো কিনা। কবে তিনি আসবেন, কিছু জানিয়েছেন কিনা।

ইত্যাদি কতো রকমের রকমারি সব প্রশ্নমালাকে নিত্যদিনই নিষ্ঠাভরেই কিন্তু আমার মা মনে মনে সাজাতেন। নিজেরই মনে মনে তার সব উত্তর সাজাতেন। একান্তভাবেই নিজের মতো করেই একটা নিজস্ব প্রস্তুতি নিতেন। সেজন্য সংসারের সমস্ত কাজকেই তো তেমন করেই ঠাকুরালির ছকে আবার সাজাতে ও করতেও হতো তাঁর। অথচ, সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হলো যে, প্রত্যেক দিনই দু'বেলাই আমার মা ঠাকুরের কাছে কিন্তু কোনও সময়েই কোনও ভাবেই কোনও ব্যাপার বিষয়েই জিজ্ঞাসিত হতেন না। রাত্রে বাড়ীতে ফেরার সময়ে মায়ের নির্বাক নিস্তব্ধতাকে লক্ষ্য করে, আর বাড়ীতে এসেই মায়ের এক অদ্ভুত নীরবতাকে প্রত্যক্ষ করে বুঝতাম–মায়ের মন ভারী হয়েছে।

ঠাকুরের যতো গল্প ছিল আমার বাবার সাথেই। পাবনা থেকে দেওঘর কতো সময়ের স্মৃতিকথার সাথে উঠে আসতো সাম্প্রতিক কাজের কত কথা। আমার বাবা কাছে না থাকলেও, ঠাকুর কোনও কোনও সময়ে বাবাকে ডাকিয়েও এনেছেন। সামনে বসে সে সময়ে কতো রকমের ঠাট্টা আর আলোচনাই যে চলতো, তার সত্যি সত্যিই কোন লেখাজোখা নেই।

কোনও কোনও দিন হয়তো আমার মায়ের সামনেই ঠাকুর আমাকে অথবা আমার ভাইদেরকেও জিজ্ঞাসা করেছেন–তোর বাপের খবর কি রে! কিংবা কোন সময়ে জানতে চেয়েছেন, তোর বাপ কবে আসফিনি? অথবা প্রশ্ন করেছেন, তোর বাপের কোনও চিঠি পাইছিস্ নাকি?

এসব ঘটনা পরম্পরায় আমার মায়ের মনের ধারণা ছিল যে, ঠাকুর আমার বাবাকে যেমন জানেন ও চেনেন, ঠিক তেমনি আমাদেরকেও ঠাকুর চেনেন ও জানেনও। শুধু যেন আমার মায়ের নিজের জগতেই মনের ভিতরে একটা জিজ্ঞাসা প্রশ্নচিহ্নের আকৃতি অবয়বেই ঘূর্ণিপাকের মতোই অনবরত ঘুরপাক খেত ভিতরে ভিতরেই। ঠাকুর হয়তো বা আমাকে ঠিক তেমন করে জানেন না, চেনেন না হয়তো বা!

আমার মায়ের এই ধারণাটা যে খুব এটা অমূলক ছিল, তা বলা যায় না। কারণ, এমনও দিন গেছে যে, আমরা সকলেই ঠাকুরের কাছেই, ঠাকুরেরই সামনে বসে থাকলেও কিন্তু ঠাকুর অন্য কাউকেই হঠাৎ করেই বললেন–এ্যাই, গব্‌রার বাড়ীত্ একটা খবর নিবি না কি রে! বাড়ীতে ফোন করে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বাবার সংবাদ জানানো হতো ঠাকুরকেই। তার পরেই ঠাকুর আমার অথবা আমার ভাইদের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে বেশ স্ফূর্তিভরেই জানাতেন–চিন্তা কিরে। তোগরের বাপ তো আস্‌তিছেই। অথচ, এ সমস্ত ব্যাপারে আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে কোনদিন কোন সময়েই কোন কথা বা সংবাদের কোনও রকমের আদান-প্রদান করেননি।

আমার মায়ের মনের গভীর প্রত্যন্ত প্রদেশের এই গোপন নীরব ভাবাটা সংসারে কোন কোনও সময়েই সরব হয়ে উঠতো। তখন আমার বাবা কেমন ফুৎকারেই সহজ আলোচনায় মায়ের সেই সব ভাবনার প্রাঞ্জল সামঞ্জস্য করে দিতেন। কথাপ্রসঙ্গেই আমার বাবাকে একদিন আমার মা বললেন–ঠাকুর সকলের সাথেই কেমন কথা বলেন, গল্প

করেন, কেমন সকলেরই সব রকমের সংবাদ নেন। আমার বাবা বললেন, ঠাকুরের খবরই আমাদের নেওয়া উচিৎ। আর সব সময়েই এমন করে চলার চেষ্টা করা উচিৎ, যাতে ঠাকুরকে উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের কোন খবর না জানতে হয়। এই যে ঠাকুর সব সময়ে আমাদের ডাকাডাকি করেন, খোঁজখবর করেন, জোর করে তাঁর কাছে টেনে ধরে রাখেন, ক্যান কও তো? এর মধ্যে কিন্তু হামবড়াই-এর কোন বাহাদুরী নেই। আসলে তিনিই জানেন যে কেমন মেকদারের মাল আমি। তাই তো অত করে হাঁকডাক, কাছে ডাকা, ভালবাসা। যাতে এরই মাধ্যমে ঠাকুরের প্রতি ভালবাসাটা, টানটা সহজে সঞ্চারিত হয়ে ঠাকুরের মনোজ্ঞ চরিত্রের অধিকারী হবার জন্য চেষ্টা করি। আমি তো আসলে সেই পাবনারই ইল্লত বালাই। এক রকমের জোর করে টেনে ধরা। বাবার কথার উপস্থাপনার ভঙ্গীতে সকলেই হেসে উঠতো সে সময়ে। স্বাভাবিক হয়ে যেত সবই। পারিবারিক যাজনের ফলে ঠাকুরের কাছ থেকে কোনও কিছু প্রত্যাশার পরিবর্তেই, ঠাকুরেরই প্রত্যাশাটাই যেন পরিবারের সকলের কাছেই বেশ বড় হয়ে উঠত।

দেওঘরে বাড়ী থাকার জন্যই প্রায় সব সময়ই আত্মীয়-স্বজন ও গুরুভাইদের সবার যাওয়া-আসার একটা স্বাভাবিক স্রোত যেন লেগেই ছিল। আমার ফুলকাকার শ্বশুরবাড়ী মধুপুরে থাকায় সকলেরই সম্মেলনটা মাঝে মাঝে ভালভাবেই জমে উঠত বেশ।

একদিন আমার ফুলকাকার শ্বশুরবাড়ীর সকলের সাথেই সকালে মধুপুরে আমি দেওঘর থেকে গেলাম। রাতে ফিরে আসার চেষ্টা করেও ওখানকার সকলের অনুরোধেই আর বাড়ীতে দেওঘরে ফিরতে পারিনি সে রাতে। মধুপুরে যাবার সময়ে বাড়ীতে মায়ের কাছে তেমন কোন সম্ভাবনার আভাষও আমি দিয়ে যাই নি।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমার মা সমস্ত রাত ধরেই বাড়ীতে অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্ করেছেন। আমি তার পরের দিনই অবশ্য খুব ভোরেই বাড়ীতে ফিরে এসেছিলাম। তা হলেও মায়ের শাসন আর বকাবকি বেশ ভালোমতোই বর্ষণ হয়েছিল। অন্যায়ের কারণে সহ্যও হল সব।

বিকালে প্রার্থনার পর ঠাকুরঘরে, ঠাকুরের সামনে প্রতিদিনের মতোই আমরা সকলেই বসেছি নানা রকমের কথাবার্তা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার আলাপ-আলোচনার মাঝেই ঠাকুর বললেন- দুনিয়ায় মায়ের মতো আর কিছু আছে না কি! মায়েক্ কোনও সময়েই অস্বস্তিতে রাখবের নাই। মায়ের কাছে সব কথা কওয়াই ভাল। মায়ের অনুমতি নিয়েই সব কাম করা লাগে। মায়ের কাছে যে সময়ে ফেরার কথা, সেই সময়ের ভিতরেই ফেরার চেষ্টা করা লাগে। পরিবেশের কোনও কিছুই যেন ভিতরের সেই ইচ্ছাকে কাবেজ করতে না পারে। মায়েক্ জানায়েই সব কাজ-কাম করা ভাল। উয়ের ভিতরে এককেন্দ্রিকতার টানের একটা সহজ স্বতঃ অনুশীলনের অভ্যাস তৈরী হয়। বাপ-মায়ের প্রতি অমন টানটাই তো আসল মাটি। ঐ বনিয়াদের উপরই যা কিছু সব দাঁড়ায়। ঘরের ভিতরে প্রাসঙ্গিক আলোচনার সূত্র ধরেই ঠাকুর আমার দিকে তাকালেন। মনে হয় অন্য কারও কোন প্রশ্নেরই উত্তরে তিনি কথাগুলো বলছিলেন। অথচ প্রাসঙ্গিক পরিপ্রেক্ষিতে যেন আমাকেও জবাব জানালেন ঠাকুর। তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়েই তিনি বললেন আমাকে–ক্যারে, তুই বুঝেছিস্? আমি মাথা নেড়ে জানালাম–আজ্ঞে হ্যাঁ। আর কথা বলারই তেমন কোন প্রয়োজন হয়নি।

সেদিনও কিন্তু আমার মায়ের মনে হল, ঠাকুর তো আমাকে একবারও কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। আমার কাছে অন্যান্য সকলের মতো করে জানতেও চাইলেন না কিছুই। এমনি যেমন সকলের দিকে নিত্য সহজ স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টিদান করেন, তার বাইরে অতিরিক্ত কোনদিনই তো ভাগ্যে জুটলো না! মায়ের মনটা কেমন যেন ধীরে ধীরে ভিতরে ভিতরে ভারী হয়ে যেতে লাগলো।

আমার বাবা অবশ্য প্রায় সবসময়ই আমাদের পারিবারিক যাজন আলোচনাতে বলতেন–জন্মজন্মান্তরের তপস্যা সাধনা সৌভাগ্য সুকৃতিতেই এ জীবনে ঠাকুরকে পাওয়া। ঠাকুরের কাছে থাকার সুযোগ পাওয়া। ঠাকুরের দৃষ্টিস্নানের সৌভাগ্য পাওয়া। তিনি আমাদের সাথে কোনও কথা বলেন কি না–তিনি আমাদের জানলেন বা চিনলেন কি না–তিনি আমাদের দিকে বিশেষভাবে তাকালেন কি না–এ সমস্ত চিন্তার দুর্ভাগ্যের আলিগোলের ভিতরে কিন্তু কোনদিনও তোমরা যেও না। তাঁর সামনে বসে তাঁকেই প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করবে। খুব করে নাম করবে। নামের নামী বিগ্রহকে প্রাণভরেই সন্দর্শনের আগ্রহকে, অনুরাগে টানে নাম করার জন্য বাড়াবে। তেমন করে চলেই তোমরা সকলেই ঠাকুরের মনোজ্ঞ হয়ে উঠতে চেষ্টা করবে সব সময়েই সব কাজেই।

বাবার এই যাজনে মনে থাকার কারণেই আমাদের কারোরই কিন্তু ঠাকুরের কাছে যাওয়াতে কোন ভাঁটার ভাব আসেনি, বরং এক অবশ্য পরিপালনীয় নিত্যকর্মের মতোই প্রতিদিনই দুবেলাই ঠাকুরের কাছে যাওয়াটার সাথে সাথেই ভিতরে ভিতরে পরিবারের সকলেরই ছিল এক অন্তর্নিহিত ঠাকুরের প্রতি কেমন চুম্বক আকর্ষণ।

আমার মায়ের সাথে কিন্তু ঠাকুরের কোন কথা বা ভাবের আদান-প্রদানই হয় না। মায়ের মনের ভিতরের সব জটই মনের ভিতরেই থাকে। হয়তো আমার মা ছাড়া আর কেউই তার কোন রকম সন্ধানই আর কেউই জানতো না।

ঠাকুর মাঝে মাঝে গাড়ীতে করে কখনও-সখনও এদিক-ওদিকেই খুবই সামান্য সময়ের জন্য বেড়াতেন। সে-সময় তিনি অনেকেরই নাম ধরে ধরে বলতেন–অমুকে

আছে নাকি? ও গেলে ভালো হয় ইত্যাদি । আমার মা সে সবসময়ে ঠাকুরের কাছে অথবা সামনা-সামনি থাকলেও, কোনদিনই কিন্তু আমার মায়ের নামটি ঠাকুর কোনও সময়ের জন্যই বলেননি ।

আমার মায়ের মনে মনে, তাঁর স্বামীকে নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে অমন সুন্দর এক মধুর লীলা-বৈচিত্র্যের সম্পর্কের জন্য হয়তো বা প্রচ্ছন্ন একটা গর্ববোধ ছিল । তারই ঠিক পাশাপাশিই আবার হয়তো মায়ের মনে এমন ভাবনাও আসতো–তাঁর স্বামীর মতো মানুষের স্ত্রীর সাথে কি একটা কথাও বলা যায় না! তখনই যেন চিন্তাটা কেমন একটা গভীর ভীষণ আকৃতির অবয়ব নিয়ে মনের ভিতরে যেন প্রশ্নচিহ্নের শরীরে এসে উপস্থিত হতো–তাহলে সত্যি সত্যিই ঠাকুর কি আমাকে একদমই চেনেন না?

মাঝে মাঝে আমাদের দুরন্ত বেহায়াপনায় দুষ্টুমিতে প্রায় অস্থির হ'য়ে শাসন করার মাঝেই মা উচ্চারণ করতেন–তোদের আর কি! তোদের তো ঠাকুর চেনেন । তোদের আর ভাবনা কি? যা করার ঠাকুরই করবেন ।

দিন আর রাত্রির মতোই, মায়ের এই সব ভাবনাগুলোও আমাদের সকলেরই যেন শুনতে শুনতেই কেমন গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল । ফলে মায়ের মনের এই ভাবনা আর মননের থেকে উঠে আসা ঝরে পড়া শব্দগুলোর ওজন যে কতোখানি ভারী আমরা কিন্তু সত্যি সত্যিই সেদিন বিন্দুমাত্রও জানতে পারিনি ।

একদিন বিকালে প্রার্থনায় যাবার জন্য মায়ের সাথে আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়েছি । আমাদের বাড়ীটা ছিল, রেল লাইন পার হয়ে ঠাকুরবাড়ীতে আসার পথেই ডান দিকের মিশন স্কুলের ঠিক বিপরীতেই 'সুধা কুটীরের' বাড়ীর পিছনের দোতলা বাড়ীটা । সুতরাং খুব একটা দূর নয় । দুবেলা হেঁটেই যাতায়াত করতাম । খুব জোড়ে হাঁটতে না পারার জন্য যেতে দেরী হচ্ছে । মা একটু জোরে ধমকের মতো করেই বলে উঠলেন,–তাড়াতাড়ি হাঁট না । প্রার্থনা করে ঠাকুরের সামনে যেয়ে বসার জায়গা হয়তো পাব না । প্রার্থনাতেও সকলের পিছনে বসে ঠাকুরকে দেখা যাবে না ।

সত্যি সত্যিই আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো, সেদিন প্রার্থনাতেও লোকও যেমন বেশী, তেমনি প্রার্থনা ও প্রণামের পরেও, ঠাকুরের ঘরেও এমন ভিড় যে পার্লারে ঠাকুরের সামনে বসার জন্য সামান্যতম জায়গাও ফাঁকা ছিল না । ফলে, আমার মায়ের আর ঠাকুরের সামনে গিয়ে বসাই হলো না । স্বাভাবিক আর সঙ্গত কারণেই সেদিন, আমার দিকেই বড় বড় চোখ করে বেশ বার কয়েক তাকালেন, নগদ দক্ষিণার মতো বকাবকিটা আর সে সময়ে মা করেন নি । পার্লারের দিকে মুখ করেই ডান দিকের দরজা দিয়ে ভিড়ের ভিতরেই কোনরকমে সকলকে পাশ কাটিয়েই সেদিনের সে সময়ে আমরা সকলেই ঠাকুরের চৌকির একেবারে পিছনের দিকেই যেয়ে কিন্তু এক সাথেই বসেছিলাম । আমাদের সামনে ঠাকুরের পিছনের পিঠ । ঠাকুরেরই ঠিক পিছনেই ছিলাম আমরা ।

ঠাকুরের সেই অবর্ণনীয় শরীরের পিছন দিকেই অপলক দৃষ্টিতে আমার মা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন ।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে একে একে কাজ বলে অনেকেই উঠে গেলেন । তারপর এক সময় সমস্ত পার্লার ঘরটাই কেমন ফাঁকা হয়ে গেল । ঠাকুরের সামনেটাও ফাঁকা । শুধু ঠাকুরই পূর্ব্বাস্য হয়ে বসে ।

আমরা ইচ্ছে করলেই সে সময়ে সকলেই কিন্তু ঠাকুরের সামনে গিয়ে বসে থাকতে পারি । কিন্তু কেন জানি না, আমার মা উঠলেন না । গেলেন না, সেই পিছনেই, একইভাবে বসে থাকলেন আমার মা, আমাদের সকলকে নিয়েই ।

সেই সময়ে ঠাকুরের শ্রদ্ধেয় শশাঙ্ক গুহদা থাকতেন, ঠাকুরের পরিচর্য্যার আরোও অনেকেরই মতো । তিনি ফাঁকা শূন্য ঘরে, ঠাকুরের একবারে পিছনেই আমাদের সকলকে বসে থাকতে দেখেই প্রথমে কেমন অবাক হলেন । তারপর তিনি মনে মনে কী ভাবলেন জানি না । সোজা হেঁটে আমাদের কাছাকাছি এলেন । মায়ের দিকে ভালো করে তাকালেন । কিছু বললেন না । আবার তিনি সোজা ফিরে গেলেন । ঠাকুরের কাছে । একেবারে ঠাকুরের সামনেই । তার পরেই তিনি ঠাকুরকেই বললেন–আপনার পিছনের দিকে–কথাটা শেষ করতে দিলেন না ঠাকুর । সঙ্গে সঙ্গে বললেন,–পিছনে বসিছিস্ ক্যা? আমার সামনে অ্যাসে বসলেই তো হয় ।

এবারে মা আমাদের সকলকে নিয়েই ঠাকুরের সামনে গিয়ে বসেই আবার প্রণাম করে মাথা তুলতেই ঠাকুর সামনে ঝুঁকে, আমার মায়ের সামনেই মুখটা এনেই মুচ্‌কী মিষ্টি হাসিতে ছোট ছোট ঢেউ তুলে বলতে লাগলেন সমানে একই কথা–আমি চিনি–আমি চিনি–আমি চিনি । এবারে থামলেন । ঠাকুরের সামনে আমার মায়ের কেমন অশরীরী স্পন্দনের কম্পিত শরীর । ভুবন ভরানো হাসিতে ভরিয়েই ঠাকুর আবার সমানে একভাবেই বলে যেতে লাগলেন একই কথা–গব্‌রার বৌ–গব্‌রার বৌ–গব্‌রার বৌ । আমি চিনি–আমি চিনি–আমি চিনি ।

খুব ছোট্টবেলায় আমার মায়ের বাবা মা-হারানো জীবনে এমন মুহূর্তের এমন সময় আর আশ্রয় যে ঠিক কেমন, তা হয়তো বা আমার মা-ই সবচেয়ে ভালো করে বলতে পারবেন ।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও আধ্যাত্মিকতা

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আধ্যাত্মিকতা–একটি সুপরিচিত শব্দ। বিশেষতঃ ভারত-বাসীর কাছে এ শব্দটি মোটেই অপরিচিত নয়। সাধারণভাবে আধ্যাত্মিকতা বলতে আমরা তাকেই বুঝি যা' বস্তুতান্ত্রিকতার ঊর্দ্ধে, যার সাথে এই জাগতিক ব্যাপার ও বিষয়ের সংযোগ নেই। মনটা সব সময় ভগবৎমুখী হ'য়ে উচ্চমার্গে বিচরণ করবে। সাধারণ সংসারী লোকের জন্য আধ্যাত্মিক জীবন নয়।

এইরকম ভাবনার জন্য আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে স'রে আছে একথা অতিনিশ্চয়। ঐ রকম ভাবনার কারণ আবার হ'ল, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা না থাকা। আমরা ভাসা-ভাসা রকমে দেখি ও শুনি এবং সেইভাবেই আমাদের ধারণা গঠিত ক'রে থাকি।

যুগ-পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সমস্ত রহস্যের দ্বার উন্মোচন ক'রে দিলেন। বহুদূরে রাখা আধ্যাত্মিকতাকে তিনি নিয়ে এলেন একেবারে ঘরের মধ্যে। তাকে ছড়িয়ে দিলেন শোবার ঘরে, রান্নঘরে, গোয়ালঘরে, সংসারের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে। তাঁর কৃপায় দূর নিকট হ'ল, অজানা এসে গেল জানার সীমানায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব'ললেন, আধ্যাত্মিকতা মানে অধি-আত্মিকতা। 'অধি' উপসর্গের মধ্যে আছে ধা-ধাতু, যার অর্থ–ধারণ, পোষণ, দান। আর আত্মিকতা শব্দটি 'আত্মা' থেকে উৎপন্ন। আত্মার মধ্যে আছে অত্-ধাতু, অর্থ–চলন, গতি। তা'হলে এক কথায় এর অর্থ দাঁড়ায়–সুষ্ঠু জীবন চলনার জন্য যা' যা' প্রয়োজন সেগুলিকে যা' ধারণ-পোষণ করে এবং তার উপকরণ জোগায় তাকেই বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিকতা।

এখন ঠিকমত বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার জন্য কী কী লাগে? লাগে খাদ্য, বন্ধুত্ব, স্বাস্থ্য, সুস্থমন, তা' ছাড়া ভালোবাসা, দয়া, স্নেহ ইত্যাদি সুকোমল গুণরাজি। এর জন্য প্রয়োজন আমার পরিবেশ, সমাজ, বিরুদ্ধ পরিস্থিতি হ'তে আত্মরক্ষার শক্তি এবং নূতন সৃষ্টির আনন্দ। এর কোনটিকেই বাদ দিয়েই আত্মিক চলন সম্পূর্ণ নয়। কারণ, আত্মা মানেই জীবনগতি। সত্তামুখী চলমানতা যেখানে নিথর, আধ্যাত্মিকতাও সেখানে ম্রিয়ল।

অনেকে বলেন, আধ্যাত্মিক জীবন আত্মিক উন্নতির ব্যাপার; ওর সাথে সাংসারিক জীবনের কোন সম্বন্ধ নেই। এখানে একটা বড় রকমের ভুল করা হয়। যে আত্মিক জীবনের কথা বলা হয় তা' কি বিদেহী আত্মার জীবন? তা' তো নয়। আমরা এই জগতের মানুষরাই তো ব'লে থাকি অধ্যাত্মবাদের কথা, আমরাই তো আধ্যাত্মিক জীবনের সাধনা করি। তা'হলে এই আমরা কারা? – বিদেহী তো নই। দেহধারী, রক্তমাংসের তৈরী, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সমন্বিত জীবই কিন্তু সবাই। তাহ'লে আত্মার উপাসনা করি আর যাই করি, এই দেহেও তার প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে বা অস্বীকার ক'রে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। দেহের উপরে ভিত্তি ক'রেই এগোতে হ'চ্ছে। দেহকে যদি বস্তু বা জড়পদার্থ বলা হয় তাহ'লে সেই জড়পদার্থকে অবলম্বন ক'রেই কিন্তু আত্মিক চৈতন্য লাভের চেষ্টা করতে হ'চ্ছে। সংসারকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ সম্ভব হ'য়ে উঠছে না। আর, সংসার (সম+ সৃ+ ধাতু) মানেই হ'ল সম্যকপ্রকারে চলা। এই সম্যক বা সমীচীন চলন যার মধ্যে আছে তাকেই সংসার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সমীচীনতা বাদ দিলে সংসারটা ভূতের বেগার বা আপসোসের আগার হ'য়ে ওঠে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–"সাংসারিক জীবনে যে অকৃতকার্য্য আধ্যাত্মিক চক্ষু তার তমসাচ্ছন্ন।" অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে হ'লে ইহ-জীবনের চলাবলা, কাজকর্ম্ম সব সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুসিদ্ধ হওয়া দরকার। বর্ত্তমানই ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইহজীবনই পরজীবনের নিয়ামক। এখন যা' করে রাখব, পরবর্ত্তী কালে তারই ফল ভোগ করব। তাই, সুন্দর সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ সংসারজীবনই আধ্যত্মিকতার ভিত্তি।

বস্তুতান্ত্রিকতার উপরেই আধ্যাত্মিকতা গ'ড়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরো স্পষ্ট করে বললেন–

"বাস্তব যা'–
তা' স্থূলই হোক,
আর সূক্ষই হোক,
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই হোক,
আর অতিন্দ্রিয়ই হোক,

তাকে বাদ দিয়ে
আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধানে
বা ঈশ্বরের অনুসন্ধানে
বৃথা ঘুরে বেড়িও না,......"

(দর্শন-বিধায়না)

আবার অন্যত্র বলেছেন–

"অধ্যাত্মজীবন যাপন মানে
বাস্তবতায় সত্তার গতিসম্বেগকে–
প্রাণন–প্রগতিকে
ধারণে, পোষণে, দানে
স্বস্থ ক'রে তোলা,
উচ্ছল ক'রে তোলা–
সপরিবেশ নিজের;
তা' না বুঝে যদি অন্য কিছু বোঝ,
তাঁ হাওয়ার লাড়ুই হ'য়ে যাবে ।"

(দর্শন-বিধায়না)

নিজের সহ পরিবেশের চলা, বলা ও করা যদি সৎ, শিষ্ট, সুন্দর ও সার্থক হয় তাহ'লে তা' আধ্যাত্মিক জীবনেরই নিদর্শন । আধ্যাত্মিকতা অন্য কিছু নয় । কিন্তু জীবনকে সৎ, শিষ্ট, সুন্দর ও সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে শুধু কতগুলি নীতির উপর দাঁড়িয়ে তা' করা যায় না । তার জন্য প্রয়োজন ঐ রকম জীবনের প্রতি অকাট্য ভালোবাসা । প্রকৃত ভালোবাসা হ'লেই রং ধরে, মানে ভালোবাসার বস্তু ও রঙে মানুষ রাঙিয়ে ওঠে । সৎ জীবনকে যথার্থ ভালোবাসলে আমার জীবনও ধীরে ধীরে সদ্‌ভাবে রাঙিয়ে উঠবে । তেমনি কোন অধ্যাত্ম জীবনযুত মানুষকে ভালোবাসলে আমার জীবনও তদনুপাতিক হ'য়ে গ'ড়ে উঠবে । কিছু গড়ে ওঠা বা হ'য়ে ওঠার মূল তুকই হ'ল এই । সেইজন্য এইপথে এগোতে হ'লে ইষ্টানুগ আচরণশীল আচার্য্য চাই-ই । তিনি মানুষের দেহ বিধানকে সুষ্ঠু-চলৎশীল রেখে অসীমের পথে তার উত্তরণ ঘটাতে পারেন । তাঁর দৃষ্টি থাকে কারণের দিকে । তাই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোন-কিছুই তাঁর কাছে অস্বচ্ছ বা অস্পষ্ট থাকে না । ক্ষুদ্র বালুকণা থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষ পর্য্যন্ত সব কিছু যাতে সাত্বত বৈশিষ্ট্যে অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, তিনি তাই করেন । তিনি পুরাপুরি সাংসারিক মানুষ হয়েও একজন পূর্ণ অধ্যাত্ম-পুরুষ । প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন লাভ করতে হ'লে এমনতর একজন পুরুষের প্রয়োজন অপরিহার্য্য । কারণ, তাঁর চলনে-বলনে, চাউনিতে ইঙ্গিতে সর্ব্বত্রই হ'তে থাকে বিচ্ছুরিত আধ্যাত্মিকতা ।

আধ্যাত্মিকতা শুধু যে মনুষ্যজগতেই সীমাবদ্ধ তা' নয়, বস্তু জগতেও আছে । যেখানেই থাকার আবেগ আছে সেখানেই আধ্যাত্মিকতা আছে । বস্তুসমূহ যে যেরূপে বর্ত্তমান, সে সেই রূপেই থাকতে চায়, বজায় রাখতে চায় তার অস্তিত্বকে । তার এই আবেগটাই আত্মিক চলন বা আত্মিকতা । শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এ বিষয়টিও নিম্নলিখিত বাণীটিতে পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন–

"বস্তুসত্তার অন্তরে নিহিত থাকে তা'র আত্মিকতা,
ঐ সত্তাকে অবলম্বন বা অধিকার ক'রে থাকে ব'লেই
তা'কে আধ্যাত্মিকতা বলে,
আর, এই আধ্যাত্মিকতাই হ'চ্ছে
তাঁর বেঁচে, বেড়ে চলার আবেগ–
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব
–তেমন ক'রে ।"

(দর্শন-বিধায়না)

অধ্যাত্ম-পুরুষের এই বস্তুসত্তার কোন দিকটাই নজর এড়ায় না । সবার মধ্যে এবং সবকিছুর মধ্যে তিনি আধ্যাত্মিকতা সন্দর্শন করেন এবং তা' জাগিয়ে তুলতে প্রযত্নপর হন ।

সর্ব্বশেষ কথা, লৌকিক জীবন যার যত শিষ্ট, সম্যক, সুতৎপর, আধ্যাত্মিক জীবনেও সে ততখানি অগ্রসর । এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । বস্তুতান্ত্রিকতার সবটুকুই অধি-আত্মিকতা । বস্তু থেকে তার আত্মিক চলনকে আলাদা করা যায় না । শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, বস্তুর মধ্যে আছে অস্তু অর্থাৎ অস্তিত্ব–থাকার চলন । এই চলাটা যাতে বিধৃত হয়, অপর কথায়, থাকাটা যাতে পাকা হয়, তেমন করাটাই আধ্যাত্মিকতা ।

সন্দীপনায় যে কোন লেখা পাঠাতে
এই মেইল নাম্বারগুলোতে পাঠান–
E-mail: tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

মানসতীর্থ পরিক্রমা

তৃতীয় অধ্যায়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

এপ্রিল, ১৯২৪

১৯২৪ সালে এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতায় আসেন এবং হরিতকী বাগানের বাসাতে উঠেন। সেখানে অত্যাধিক লোকের আগমন হওয়ায় স্থান-সঙ্কুলান হ'তো না, সেজন্য হরিতকী বাগানের অনতিদূরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য একটি বৃহৎ বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়। তিনি এলে সেই বাড়ীতেই অবস্থান করতেন।

সে সময়ে সৎসঙ্গ থেকে বায়ুচালিত তড়িৎযন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল। তার জন্য সাহায্য প্রার্থী হ'য়ে শ্রদ্ধেয় কেষ্টদা, যতীন রায় ও আমি দেশবরেণ্য নেতা ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করতে যাই। শ্রীযুক্ত হেমেন দাশগুপ্ত (যিনি পরে দেশবন্ধুর জীবনী লেখেন) সঙ্গে থেকে প্রথমে দেশবন্ধুর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দেশবন্ধু বললেন,-"এ কোন সৎসঙ্গ, পাবনার কি?"

আমরা হাঁ বলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উঠলো। খুব আগ্রহের সঙ্গে তিনি বললেন, "তাঁর কথা আমি বারীনের কাছে অনেক শুনেছি; বহু দিন থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগ্রহ জেগেছে।"

শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন দীপান্তর হ'তে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহচর্য্যে হিমাইতপুরে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন এবং তাঁর চরিত্রমাধুর্য্যের এবং তাঁর সহিত আধ্যাত্মিক আলাপ-আলোচনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি সৎসঙ্গ থেকে ফিরে এসে দেশবন্ধুকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলেন এবং তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় "সৎসঙ্গের মধুচক্র" নামে এক প্রবন্ধ বের করেন।

দেশবন্ধু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের ঠাকুর এখন কোথায় আছেন?"

আমরা বললাম, "কলকাতায়ই আছেন।"

তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "এখানে কোথায়?"

আমরা বললাম, "মানিকতলায়।"

একথা বলতেই তিনি বললেন, "বাড়ীটা কোথায়, বাড়ীর নম্বর কত? আমি আজই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

তাঁর এই উত্তেজনা আমাদের অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট করল, তাঁ'তে তাঁকে যে বিষয় বলবার জন্য গিয়েছিলাম সেদিনকার মত সে বিষয় চাপা পড়ে গেল।

তিনি বললেন,-"আজ করপোরেশনের একটা সভা আছে, সেই সভাতে আমাকে যোগদান করতেই হ'বে। সেই সভার শেষে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে যাব। আপনাদের একজন যদি কর্পোরেশনের সভাভঙ্গের সময় উপস্থিত থাকেন তাহ'লে ভাল হয়।"

সুধীর মুখার্জ্জী ব'লে একজন সৎসঙ্গী, পূর্ব্বে কংগ্রেসকর্ম্মী হিসাবে যিনি দেশবন্ধুর সাথে পরিচিত ছিলেন, এই কাজের ভার নিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল, তবুও তাঁরা এলেন না দেখে আমরা একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে রইলাম। পরে সুধীর এসে খবর দিলেন যে মিটিং ভাঙ্গতে অনেক দেরী হ'য়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই আবার রাত্রি ৯টায় ট্রেন ধরতে হ'বে সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিত্ব করার জন্য। সেজন্য তিনি আজ আর আসতে পারলেন না, খবর পাঠালেন, সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স্ থেকে ফিরে এসে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত দেখা করবেন।

আজ দেশবন্ধু আসছেন না এবং রাত্রের গাড়ীতে সিরাজগঞ্জ যাচ্ছেন শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বললেন, "আপনিও ও গাড়ীতে সিরাজগঞ্জ যান। ট্রেনে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন।"

আমি বললাম, "তিনি তো' ফার্স্ট ক্লাশে যাবেন, আমাকেও তাহ'লে ফার্স্ট ক্লাশে যেতে হয়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই।"

তখন-তখনই ভিক্ষা করে যাতায়াতের ভাড়া সংগ্রহ করা হ'লো তাড়াতাড়ি আহারাদি ক'রে শিয়ালদহ স্টেশনে রওনা হ'লাম এবং যে কামরা দেশবন্ধুর জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেই কামরাতে পূর্ব্ব হতেই স্থান নিলাম। তারপর দেশবন্ধু এবং অন্যান্য নেতারা এলেন।

কামরাতে আমাকে দেখে তিনি আশ্চার্য্যান্বিত হ'লেন, বললেন, "আপনিও সিরাজগঞ্জ যাচ্ছেন নাকি?"

তারপর অন্যান্য নেতারা যে যার স্থানে চলে গেলেন, গাড়ী ছেড়ে দিল। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত তাঁর সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর ও সেই সম্পর্কে অনেক আলাপ-আলোচনা হল। তারপর তিনি শয্যাগ্রহণ করলেন, আমিও শুয়ে পড়লাম। সিরাজগঞ্জ

স্টেশনে পৌঁছবার আগে থেকেই দেশবন্ধুকে দেখবার জন্য প্রত্যেক স্টেশনেই যথেষ্ট লোক হয়েছিল। সিরাজগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছাতেই সেখানকার নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকরা আমি দেশবন্ধুর লোক এই ভেবে আমার বিছানাপত্র দেশবন্ধুর জিনিষপত্রের সাথে নিয়ে গেলেন এবং দেশবন্ধুর যে বাড়ীতে থাকবার স্থান হল আমরাও সেখানে স্থান হল। দেশবন্ধুর সঙ্গে যাওয়াতে একটা লাভ হল এই-বঙ্গের বিশিষ্ট সব নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেলাম সেখানে। এই রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও তিনি যখনই সময় পেতেন তখনই আমাকে ডেকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতেন। সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স শেষ হবার পর আমি কলকাতায় ফিরে এলাম, দেশবন্ধু তার-একদিন পরে ফিরলেন। ফিরবার পরই একদিন সন্ধ্যার সময় দেশবন্ধু মাণিকতলা বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসলেন। তখন বাড়ীটি কীর্ত্তনানন্দে মুখরিত হয়ে যেন ফেটে পড়ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর দোতলার ছাদে মাদুর পেতে শুয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। দেশবন্ধুকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর যেন চিরপরচিতের ন্যায় উঠে বসে-আসুন দাদা, বসুন! এই সম্বোদ্ধন করে সেই মাদুরে বসালেন।

নানা কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। স্বরাজ, নন-কোঅপারেশন, চরকা ইত্যাদি বহু বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হতে লাগল। ...মহাত্মাজীর কথা উঠল, দেশবন্ধু বললেন-মহাত্মাজীকে আমি প্রথম আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ ভেবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিলাম; তাই এক বৎসর তাঁর কথামত চল্‌ব ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তাঁর moral discipline দেখে সত্যিই অবকা হ'য়েছি কিন্তু তাঁর vision সম্বন্ধে ক্রমশঃ disappointed হ'লাম। তাই এক বছর পরে non-co-operation ছেড়ে দিয়ে আমরা স্বরাজ্য দল গঠন করেছি।

চরকা ও খদ্দরের কথায় বললেন-তা'তে যে দেশের উপকার হবে তা আমি বিশ্বাস করি কিন্তু ওতে যে দেশোদ্ধার হবে তা আমি বিশ্বাস করি না। তবে মহাত্মাজীর ওতে খুব দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন-"দেখুন দাশদা, শুধু খদ্দরে কি হবে? আর জেলে গেলেই বা কি হবে? ইংরাজকে কি এমন শক্তিহীন মনে করেন যে শুধু খদ্দর পরলেই আর জেলে গেলেই তারা ভারত ছেড়ে পালিয়ে যাবে? শুধু জেলে গেলে যা' হয় তাই হয়; স্বাস্থ্য ক্ষয়ে শক্তি নষ্ট হয়।"

দেশবন্ধু প্রশ্ন করলেন-"তবে কি ক'রবো?"

শ্রীশ্রীঠাকুর-"দেশটাকে কেমন করে সেবা দিয়ে দেশের অন্তর জয় করেছে। আপনারাও যদি দেশের সেবায় লেগে যান-কোথায় দেশবাসীর দুঃখ, জনসাধারণের কোথায় অভাব, প্রাণে-প্রাণে দরদ দিয়ে বুঝে তা দূর করবার জন্য তীব্রভাবে লেগে যান-আর আপনাদের সেবা যখন দেশবাসী ইংরেজের সেবার চাইতে বেশী বলে প্রাণে-প্রাণে বুঝবে তখন 'স্বরাজ' বলে চীৎকার না করলে ও স্বরাজ আপনিই আসবে।"

দেশবন্ধু-"কিন্তু যা করতে যাই, তাতেই তো ইংরেজরা বাধা দেয়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর-এমন জায়গায় এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় যাতে কারো সঙ্গে বিরোধ না লাগে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশে আসে, তখন তারা এলো তাদের ব্যবসা নিয়ে, তাদের কৃষ্টি নিয়ে। তাদের ব্যবসা দিয়ে দেশবাসীর চাহিদা মেটাতে লাগলো, সঙ্গে-সঙ্গে তাদের higher culture establish করাতে লাগলো। পাদ্রীরা বসিয়ে দিল স্কুল, প্রেস, হাসপাতাল ইত্যাদি। সে-সব ক্রমশঃ দেশে মন জয় করে নিলো। আপনারা যদি তেমনই ওদের শুধু গালাগালি না দিয়ে, শুধু বক্তৃতা না দিয়ে দেশের কোথায় ব্যথা তা অনুভব ক'রে দেশকে সেবা করতে লেগে যান তবেই না আপনারা দেশকে জয় করতে পারবেন। মানুষের সব রকম অভাব দূর করা-এ যদি politics হয় তবে এই আমার politics."

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সব বাক্যালাপ শুনে বন্ধু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বললেন-"তবে কি করবো বলে দিন। আমারও এ রাজনীতি ভাল লাগে না। কিন্তু এমন জড়িয়ে গেছি সব তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন প্রশ্ন করলেন,-"আচ্ছা দাশদা, এই যে উপযুক্ত লোক পাচ্ছেন না বলছেন-এটা কেন বলতে পারেন? কেন এত বড় দেশটায় আপনার সাহায্যকারী একজনও খুঁজে পান না, সে কথা একবার ভেবে দেখেছেন কি?"

দেশবন্ধু বললেন-"যা'র উপর ভার দিতে যাই, সেই ঠিকমত পারে না। আবার যার ভাল করি, সেই হ'য়ে ওঠে নিন্দুক, বিশ্বাসঘাতক।"

শ্রীশ্রীঠাকুর-"দেখুন তবে, আপনিই বলেছেন সারা বাংলায় মানুষর মত মানুষ খুঁজে পাচ্ছেন না। অথচ একা আপনি তো স্বরাজ আনতে পারবেন না। সাহায্যকারী না পেলে কাজ করবেন কা'দের দিয়ে?

"আরো দেখুন, দেশে মানুষের মত মানুষের অভাব আপনারা

দেখতে পাচ্ছেন, অথচ এত তাড়াহুড়ো ক'রে আপনারা স্বরাজ আনতে চাইছেন তাতেই তো বোঝা যায় যে আপনারা স্বরাজ চান না। যদি চাইতেন তবে আমার মনে হয়– আগে মানুষ তৈরী করতেন; তা না করে আপনারা শুধু ইংরেজের দোষই দেখছেন। ওদের দোষ দেখতে দেখতে ওদের কি গুণে আমাদের ওদের অধীনে থাকতে হচ্ছে, তা' আর নজরেই পড়ছে না।

"দেশে মানুষ হ'বে কি করে দাশদা, দেশের সমাজটা একদম পঁচে গেছে। ঘরে-ঘরে অশান্তি; দাম্পত্য সুখ নেই, শিশু-মৃত্যু। আজকাল বিবাহই ঠিকমত হচ্ছে না তাই ভাল ছেলে হবে কি করে? সমাজকে যদি সংস্কার করতে পারেন তবে অসম্ভব নয় যে কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এমন সব যুবক পাবেন যারা দেশে কর্ম্মীর অভাব দূর করবে।"

দেশের, সমাজের, স্বাস্থ্যের, অর্থের, সুশিক্ষা সম্বন্ধে কথা হতে লাগল যা' দেশবন্ধুর মত আমাদেরও অন্তর স্পর্শ করলো। দেশবন্ধু মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখনিঃসৃত কথা শুনতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এইসব কথা শুনতে-শুনতে দেশবন্ধু বলতে লাগলেন–"আমি এসব কাজে মনপ্রাণ দিয়ে লাগতে পারছি না। পল্লী-সেবাই যেন আমার মন চায়। আর এমন করে গোলমাল বাড়িয়ে স্বরাজ হবে না তাও বুঝি। তবুও এই মরা দেশকে একটা হুজগে মাতিয়ে রাখতে চাইছি, আর কেমন করে নিজেই যেন সেই হুজুগের ঘূর্ণিপাকটাতে পড়ে গেছি।"

শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–"দেখুন দাশদা, যিনি সবটা দেখেন এমন একজন ঋষি বা Seer পিছনে না থাকলে কোন কাজ হয় না। অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণ ছিল। রামদাস ছিল বলে শিবাজী মহারাষ্ট্রজাতি গ'ড়ে তুলেছিল, আর চাণক্য ছিল বলেই চন্দ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্ত হ'তে পেরেছিল। আর রাণা প্রতাপ এতো শক্তিশালী হয়েও, অত করেও তেমন কিছু গড়ে তুলতে পারল না; শুধু তার পিছনে অমন কেউ ছিল না বলেই।"

দেশবন্ধু তখন বালকের মত বললেন–"তবে কি করতে হবে আমায় বলে দিন।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–"নাম, খুব নাম করতে হয়, দাদা!"

দেশবন্ধু–"নাম তো কত করেছি। কই কিছুই তো হ'ল না।"

শ্রীশ্রীঠাকুর–"শুনে নিতে হয়, কি করে করতে হয়। আর তাই অনবরত করতে হয়।"

দেশবন্ধু–"কেমন করে করবো বলে দিন।"

শ্রীশ্রীঠাকুর–"মার কাছে শুনে নিন, মা জানেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের জননী, মনোমোহিনী দেবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আসতেই দেশবন্ধু উঠে গিয়ে তাঁর পাশে বসলেন। দেশবন্ধু দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করতেই মা বললেন–"দেখ, তোমরা বড়লোক। বড়-বড় লোকদের আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। তারা ভগবানকে যেন অনুগ্রহ করে।"

অদূরে শ্রীশ্রীঠাকুর বসেছিলেন তাকে দেখিয়ে মা বললেন–"ও বালক, ওর কি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে? ওর কথায় অনেকে লাফিয়ে উঠে, শেষে ঠিক থাকতে পারে না। যাও, গিয়ে মন ঠিক করে এসো। তোমাদের মত বড়লোকের আমাদের কাছে নাম নেওয়া সাজে না।"

মার কথা শুনে দেশবন্ধু বললেন–"মা! আমি আপনার দয়া পাব না, তা আমি জানি। আমার মত পাপীর উপর দয়া কেমন করে হবে? মা, জগন্নাথের মন্দিরে কত লোক যায়, আমি অভিমানে সে মন্দিরে কখনো ঢুকিনি। জগন্নাথ সবাইকে দয়া করেন দেখতে পাই, শুধু আমাকেই করেন না।"

দেশবন্ধুর কাতরোক্তিতে মায়ের মন ভিজে গেল।

মা বললেন–"দেখ, কত জনকেই তো দেখলাম। তারা কিছুদিন বাদেই ছেড়ে দেয়। ধরে থাকতে পারে না। শেষে বলে ওতে কিছু হয় না। শেষে কত কি বলে নিন্দা করতে আরম্ভ করে। তুমি চিত্তরঞ্জন, দেশজোড়া তোমার নাম। কত লোক তোমাকে মানে। কত বড়লোক তুমি। আর বড়লোক যখন আমাদের মত লোকের কাছে আসে তখন কৃতার্থ করতেই আসে। তাই বলি যদি কৃতার্থ করতেই এসে থাক তবে নাম নিয়ে তোমার কাজ নেই। অন্যান্য বড়লোকের মত তুমিও কিছুদিন বাদে সব ছেড়ে দেবে।"

চিত্তরঞ্জন মায়ের কথা শুনে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন–"মা, চিত্তর অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্তু তার পরম শত্রুও একথা কখনো বলবে না যে সে যেখানে-সেখানে গিয়ে মাথা নত করে। আর যেখানে সে মাথা নত করে সেখান থেকে মাথা কখনও উঠায় না। আমি মা কৃতার্থ করতে আসিনি, কৃতার্থ হতেই এসেছি। আপনি আমায় দীক্ষা দিন।"

দেশবন্ধুকে দীক্ষা দিলেন ও কত কথা বললেন। দীক্ষা গ্রহণান্তে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ও মায়ের পদধুলি নিয়ে নেমে গিয়ে মোটরে উঠলেন। ১৯২৪ সালের ১৪ই মে দেশবন্ধু দীক্ষা গ্রহণ করেন।

দেশবন্ধু দীক্ষা নেবার পর বিশেষ করে বাংলার রাজনৈতিক মহলে ও তাঁর স্বরাজ্য পার্টিতে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল।

তাদের মধ্যে অনেকের এই ধারণা হল যে ধর্ম্মের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে তিনি হয়ত রাজনৈতিক আন্দোলন ছেড়ে দেবেন। সেইজন্য তারা তাঁর এই দীক্ষা ভাল চক্ষে দেখল না। আর এক দল ছিল যারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভাল চক্ষে দেখতো না। তাদের অভিমত হল যে, দেশবন্ধুকে যে করেই হোক শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আর যেতে না দেওয়া এবং তার জন্য উপায় উদ্ভাবন করা।

এই দলের কয়েকজন একদিন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়কে এই কথা জ্ঞাপন করে শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, গিরীশ জীবনী ও নাট্যসমালোচনা লিখে পদক পুরষ্কার লাভ করেছিলেন। তিনি এম-এ, বি-এল; উকীল ছিলেন। হেমেন্দ্রবাবু তাদের এই অভিমত জেনে বলেন–"তোমরা এরূপ চেষ্টা থেকে বিরত হও। আমি জানি, শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্বন্ধে,–he has got a very strong feeling. তোমরা কর্ত্তার কাছে (দেশবন্ধুকে তাঁরা কর্ত্তা বলতেন) শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে কোন কথা বললেই তিনি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবেন। তাঁর অসন্তোষভাজন হয়ে তোমাদের কি সুবিধা হবে?"

শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রবাবু নিজেই একদিন আমাকে এ কথা বলেছেন। অনেকের আবার ধারণা–দেশবন্ধু মোটেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেননি। এ কথা খণ্ডন করার জন্য তাঁদের শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের লিখিত "দেশবন্ধু জীবন-চরিত্র," প্রথম সংস্করণ পাঠ করতে বলি। তাতে তিনি এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তা পাঠ করলেই তাঁদের ভ্রম নিরসন হবে।

দীক্ষা গ্রহণের তিনদিন পরে দেশবন্ধু আবার মাণিকতলার বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এই দিন গ্রামসংগঠন কি করে করতে হবে বিশেষ করে সেই কথা হল। গ্রামে-গ্রামে কুটির-শিল্প স্থাপন, গ্রামে ছোট-ছোট ব্যাঙ্ক স্থাপন করে শিল্পের উন্নতি হতে পারে ও দারিদ্র দূর করা যায়, কেমন করে গ্রামবাসী শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, চরিত্রে, কর্ম্মনৈপুণ্যে নুতন জীবন লাভ করতে পারে–এই সমস্ত কথাই হল। দেশবন্ধু যাবার সময় বলে গেলেন–আমি আমার Forward পত্রিকায় শীঘ্রই Village re-organisation scheme (গ্রাম–সংস্কার)-এর কথা প্রকাশ করব। তার কয়েক দিন পরেই তিনি গ্রাম-সংস্কারের কথা ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেদিন মাণিকতলার বাড়ী থেকে বিদায় নেবার সময় দেশবন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুরকে আর একটি অনুরোধ জানিয়ে যান। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেন–"দেশের কাজ করে আর সময় পেয়ে উঠি না যাতে ইচ্ছা করলেই আপনার সঙ্গসুখ লাভ করতে পারি। আপনার কর্ম্মীদের মধ্যে যদি এমন একজনকে দেন যিনি আমার বাড়ীতে যেয়ে মাঝে-মাঝে থাকতে পারেন; তবে তাঁর সঙ্গে অবসর মত গল্প করে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–"আচ্ছা চিন্তা করে দেখব। আপনার বাড়ীতে কাউকে পাঠাবার চেষ্টা করবো।"

দেশবন্ধু চলে যাবার কিছুদিন পরে আমাদের পাবনা ফিরে যাবার কথা হচ্ছে এই সময় একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ডেকে বললেন–"আপনাকে তো কাজের জন্য প্রায়ই কলকাতায় আসতে হয়। কলকাতায় এলে দেশবন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে উঠবেন ও তাঁর সঙ্গে গল্প করবেন।"

আমি বললাম–"ঠাকুর, ওঁরা বড়লোক। ওঁদের ওখানে যেয়ে থাকা-খাওয়া কি আমাদের মত সাধারণ মানুষের পোষাবে? কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আলাপ-আলোচনাদি করতে পারি, কিন্তু ওঁর বাড়ীতে থাকাটায় আমার মন সায় দিচ্ছে না।"

শ্রীশ্রীঠাকুর–"হলেনই বা তিনি বড়লোক। তাঁর বাড়ীতে থাকতে আপনার বাধবে কেন? পুনরায় কলকাতায় এলে ওঁর বাড়ীতে গিয়েই উঠবেন।"

শ্রীশ্রঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য করে এর পরে আশ্রমে যেয়ে পুনরায় কলকাতায় আসবার প্রয়োজন হল। সেবার কলকাতায় এসে দেশবন্ধুর ভবানীপুরের বাড়ীতে যেয়েই উঠি। দেশবন্ধু আমাকে পেয়ে মহাখুশী। দোতালায় যে ঘরে তিনি থাকতেন তার পাশের ঘরে আমার থাকবার স্থান নির্দ্দেশ করে দিলেন।

তাঁর বাড়ীতে থাকার দরুন তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ হল। তাতে দেশবন্ধু কি মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন তা বুঝবার সুযোগ মিললো। তিনি সকালে আগত কংগ্রেসনেতা ও কর্ম্মী ও অন্যান্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে বেলা ৮টা সাড়ে ৮টা নাগাদ বেরিয়ে যেতেন আর বেলা ১২/১ টা নাগাত ফিরতেন। আবার বেলা ৩টার পর বেরিয়ে রাত্রি ১০/১১ টা নাগাদ ফিরতেন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'burning the candle at both ends,' আমার মনে হয় দেশের জন্য এইরূপ অমানুষিক পরিশ্রম করে তাঁর জীবনদীপ

অকালে নির্ব্বাপিত হয়ে গেল!

সে-সময়ে তিনি স্বরাজ্য পার্টি গঠন-সম্বন্ধে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। কোন-কোন দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ও তারপরে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত তাঁর ঘরে অথবা বারান্দায় বসে আলাপ-আলোচনা চলত। অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানে, গুণে তিনি কত শ্রেষ্ঠ। তাঁর কাছে আমি বালক বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ তিনি এতই নিরভিমানী ছিলেন যে আমার প্রত্যেকটি কথাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন এবং বিচার-বিশ্লেষণ করে তার দোষ-গুণ বলে দিতেন।

একদিন আশ্রমের কথা-প্রসঙ্গে Wind-Power Dyamo-র কথা বললাম। তিনি হেসে বললেন–"আমিও ফকির হলাম আর আপনারাও এলেন। আগেকার সময় হলে আমিই এটাকে গড়ে তুলতে পারতাম।"

সে সময় নিঃস্ব হয়েও তিনি আমাদের দু-হাজার টাকা এজন্য দিয়েছিলেন। তিনি অন্যের সঙ্গে অংশীদার হিসাবে একটা কেমিক্যাল ওয়ার্কস খুলেছিলেন। সেটা উঠে যায়। তবে কতকগুলি furniture ও যন্ত্রাপাতি ও একটি fine chemical balance আমাদের বিজ্ঞানাগারের জন্য দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের ব্যবহৃত ছোট Remington type-writer-টাও আমাদের দিয়েছিলেন, সেটা এখনও আছে।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনাতে বুঝতে পারছি যে গান্ধীজীর মতবাদের সঙ্গে আপনার মতবাদের গভীর পার্থক্য, তা সত্ত্বেও আপনি গান্ধীজীকে guide বা আদর্শ বলে গ্রহণ করলেন কি করে?"

উত্তরে তিনি বললেন–"যখন মহাত্মাজী খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করলেন যে– Either I shall raise the banner of Swaraj by the 31st of December or retire to the Himalayas,–তখন আমি মনে করলাম দেশের তো এই শোচনীয় অবস্থা, এ অবস্থায় ৩৩শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ আনতে পারে কি করে? হয়তো তিনি ঋষি, ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন, তাই এরূপ বলেছেন। আর, যদি তিনি ঋষিই হন তাহলে তো তাঁকে অনুসরণ করাই আমার কর্ত্তব্য। এই মনে করে আমি তাঁর নির্দ্দেশ মেনে নিয়েছিলাম। শেষে বোম্বের জুহুতে আমি ও মতিলাল নেহরু যখন argument- এ তাঁকে corner করি তখন দেখি যে তিনি তাঁর পূর্ব্বেকার কথা থেকে সরে যাচ্ছেন, আমাদের argument-এ এঁটে উঠতে না পেরে;–তখন আমার ভুল ভাঙ্গল। আমি মনে করলাম–ঋষি ভবিষ্যৎ দেখতে পান, তাই তিনি কখনো তাঁর মত বদলান না। তাই ইনি ঋষি নন। তাঁর কতকগুলি moral principle আছে। সেগুলি তিনি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন। আর কিছুই নয়। তখন থেকেই আমার সাথে পদে-পদে বিরোধ বাধতে লাগল। শেষে বাধ্য হয়েই আমি আর মতিলালজী স্বরাজ্য দল গঠন করলাম।"

দেশের সম্বন্ধে, দেশের নেতাদের সম্বন্ধে, বাংলাদেশ সম্বন্ধে তখন কত কথাই যে দেশবন্ধুর সঙ্গে হয়েছে এখন আপশোষ হয় যে সে-সম্বন্ধে কোনও নোট রাখিনি। তা থাকলে একটা অমূল্য সম্পদ হত। সে-সব কথা স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে। দেশবন্ধুর গৃহে দেশবরেণ্য ভারতের সব নেতাদের শুভাগমন হ'ত। সেখানেই মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ও আলাপ হয়। তাছাড়া বাংলার সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, তুলসী গোঁসাই, প্রভৃতির সঙ্গেও গভীরভাবে মেলামেশা করবার ও শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে বলবার শুভ-সংযোগ ঘটেছিল।

মহাত্মাজী ১৯১৫ সালের গোড়ায় আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন, তারপর থেকে কলকাতা এলে দেশবন্ধুর বাড়ীতেই উঠতেন; তাঁদের মতানৈক্যের পরেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। একবার আমি তাঁর ওখানে থাকাকালীন তাঁর গৃহে মহাত্মাজীর শুভাগমন হ'ল। মহাত্মাজী তখন চরকা-প্রচারে উন্মত্ত বললেই হয়। একদিন কথা-প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলতে লাগলেন কি করে চরকা দ্বারা দেশ উদ্ধার হবে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে, চরকা ব্যাঙ্ক স্থাপিত হবে ইত্যাদি। প্রায় ৫০ মিনিটকাল তাঁর সঙ্গে চরকা সম্বন্ধে আলাপ করে আমার মনে হল–নিজেকে এমন গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলছেন বলেই না অনচ্ছিুক জনগণের মধ্যে তাঁর এই চরকা movement এভাবে চালিয়ে যেতে পারছেন!

চরকা বিষয়ে এইসব আলোচনার পর তিনি বললেন–"গীতাতেও তো চরকার কথা আছে।"

আমি বললাম–"সে কি? গীতায় চরকার কথা?"

তিনি বললেন–'এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রম্।' আমি তাঁর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলাম। তিনিও সেইহাসিতে যোগ দিলেন।

...একদিন মহাত্মাজীর সঙ্গে একই মোটরে হাওড়া ময়দানে এক মিটিং-এ গেলাম। মহাত্মাজীকে আর মোটর থেকে কিছুতেই নামান যায় না। চারিদিকে বিপুল জনগণ তাঁকে ঘিরে ধরেছে এবং তাঁর স্পর্শে ও পদধূলিতে মহাপুণ্য হবে

মনে করে অসংখ্য হাত তাঁর মাথায় পড়ছে; কারণ পা তো মোটরের মধ্যে রয়েছে, তা স্পর্শ করার ক্ষমতা নেই। মহাত্মাজী অসংখ্য হাতের স্পর্শের চাপে বিব্রত হয়ে বলতে লাগলেন 'এ ক্যায়া রে, এ ক্যায়া রে'। শেষে অতি কষ্টে স্বেচ্ছাসেবকগণ জনগণের ভক্তির আতিশয্য থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। তখন তিনি জনগণের নিকট যুগাবতার বলে প্রখ্যাত হয়েছেন, তার দরুন জনগণের হাতে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি!

একবার সরোজিনী নাইডুর স্বামী ডাঃ মেজর নাইডু মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করতে দেশবন্ধুর বাড়ী এলেন। শুনলাম তিনি সরোজিনী নাইডুর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছেন। বুঝলাম সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে তাঁর স্বামীর তেমন বনিবনাও নেই।

দেশবন্ধুর বাড়ীতেই সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তারপর দ্বিতীয় বার তাঁর সঙ্গে দেখা, দিল্লী ক্লথ-মিলের সত্ত্বাধিকারী লালা শ্রীরামের দিল্লীস্থ সুরম্যবাটিতে। সেবার তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবে পাবনার আশ্রমে যেতে আমন্ত্রণ জানালাম। তিনিও সাগ্রহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং সময় মত কলকাতা অবধি এলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার একজন প্রসিদ্ধ জননেতা তাঁকে আশ্রম-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা বলে তাঁর মনে সংশয় জাগিয়ে দিলেন। সরোজিনী নাইডু কলকাতা থেকে ফিরে গেলেন। আশ্রমে আর এলেন না।

এই ঘটনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি কথা আমার মনে পড়ে। তিনি দুঃখ করে আমায় একদিন বলেছিলেন–দেখ, আমার এই শান্তিনিকেতনে বিশ্বের বড়-বড় লোকের পদধূলি পড়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার বড়লোকের পদধূলি আজও পড়ল না!

বিধাতার কি অভিসম্পাত জানি না, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর ভাল দেখতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সেই দিনের আর-একটি কথা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে আছে। তিনি সেদিন দুঃখ করে আমায় বলেছিলেন–"দেখ, এই বৃদ্ধবয়সে অপটু শরীর নিয়ে ছেলে-মেয়েদের নাচিয়ে আমার এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে হচ্ছে।"

সেখানে সেদিন রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কথার উত্তরে আমি বললাম–"আপনি না হয় যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন এই প্রতিষ্ঠান এ রকম করে চালাবেন। কিন্তু আপনার পরে এ রকম করে কে এই প্রতিষ্ঠান চালাবে?"

উত্তরে তিনি বললেন–"দেখ, সে চিন্তা আমার নয়। শিল্পী যে, সে মনের আনন্দে গড়ে যাবে; ভবিষ্যতের চিন্তা তার কাছে স্থান পায় না। ভবিষ্যতে যারা আসবে তারাই সে চিন্তা করবে।"

সুখবর! **সুখবর!!** **সুখবর!!!**

আপনি কি নতুন লেখক? আপনার লেখা- গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল লেখাগুলি প্রকাশ করতে আগ্রহী? তাহলে নিম্ন ঠিকানায় আজই যোগাযোগ করুন। আমরা শর্ত সাপেক্ষে আপনার লেখা ছাপার উপযোগী হলে অবশ্যই ছাপাবো।

এছাড়া নভেল, নাটক, অনুবাদগ্রন্থ, সিরিজ গ্রন্থ, সাধারণ জ্ঞানের বই, কোরআন, হাদীস ও অন্যান্য সকল ধরণের বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

নিউজ কর্ণার পাবলিশিং
সিদ্দিকীয়া মিনি মার্কেট, আন্ডারগ্রাউন্ড
চাঁদনী বাজার, বগুড়া।

সৎসঙ্গের নিজস্ব ওয়েব সাইট ভিজিট করুন
www.srisrithakuranukulchandrasatsang.com

চিরঞ্জীব বনৌষধি

(১ম খণ্ড)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য

হিলমোচিকা

গল্প শুধু গল্প হ'লেই কি ভাল ? তার মধ্যে যদি স্বল্পও সংগীত থাকে তবেই না সে গল্প।

আজকের যুগের গল্পে আর সে-যুগের গল্পে ব্যতিক্রম এখানেই।

নিবন্ধটা লিখতে ব'সে ভাবছি, সে গল্পের সমীক্ষায় কি ছিল, তারই একটা ঈঙ্গিতে কি এইটাই পাওয়া যায় যে, এই ভেষজটির নাম তার আঙ্গিক বিচারে না গুণ বিচারে? তাও বিচার্য।

তা সে যাই হোক, নামের উৎসটাই আগে দেখা যাক।

এখানে একটা কথা আগেই মনে পড়ে যায়, দ্বাদশ শতকের মহাকবি শ্রীহর্ষ তাঁর নৈষধ চরিত উপাখ্যানের নায়িকা দময়ন্তীর নলের প্রতি পূর্বরাগ বর্ণনায় তিনি চক্রাঙ্গকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন নলের কাছে; কিন্তু সেই চক্রাঙ্গ বুঝতে ষষ্ঠ শতকের অমর-কোষের সাহায্যেই বোঝা গেল যে, এই চক্রাঙ্গ হলো হংস, আবার সেই চক্রাঙ্গেও আর একটি পর্যায় শব্দও হিলমোচিকা; এদিকে ভেষজ হিলমোচিকার নামটি যখন চক্রাঙ্গীতে পাওয়া গেল, তখন নৈষধের চক্রাঙ্গকে এখানে উপস্থাপিত করা সমীচীন হবে না; তাহলে এখন নামটির মধ্যে আরও অন্য কোন অর্থকে উপজীব্য ক'রে এগিয়ে দেখাই সমীচীন।

অথর্ববেদিক উপবর্হণ সংহিতায় ৫/৪১/২২৭ সূত্রে উল্লেখ আছে–

অবসৃষ্ট পরাগত চক্রাঙ্গে ব্রহ্ম সংশিতে।
গচ্ছামিত্রান্ প্রপদ্য স্ব মামীষাং কং চ নোচ্ছিষ ৷৷

এই উক্তটির উবট্ ভাষ্য ক'রেছেন–

ব্রহ্মণো মন্ত্রেণ সংশিতা তীক্ষ্ণীহতা চক্রাঙ্গ ত্বং বিষঘ্নী।
ত্বম্ অবসৃষ্টা অস্মাভির্মুক্তা পরাগত শরীরে পতিতা ভব।
চক্রং=রুচিকরং অঙ্গং অস্যা ইতি চক্রাঙ্গা। সাতু হিলমোচিকা।
অমিত্রান্ শত্রূণ্ গচ্ছ প্রাপ্নুহি অমিষাং শত্রুণাং=জীবশোণিত
শত্রূণাং মধ্যে কং চ ন উচ্ছিষ=সর্ব্বান্ ভেদয়।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো–ব্রহ্মার মন্ত্রের দ্বারা তোমার তীক্ষ্ণতা সাধিত। তাই তুমি চক্রাঙ্গ, তুমি বিষঘ্নী, তুমি আমাদের দ্বারা অবসৃষ্ট হয়ে (নিক্ষিপ্ত হয়ে) শত্রুর শরীরে প্রবেশ কর। রুচিকর অঙ্গ, তাই তোমার নাম চক্রাঙ্গা ; এখানে এই চক্রাঙ্গাকে বৈদিক অভিধানে যাস্ক ব'লেছেন হিলমোচিকা। উপবর্হণ সংহিতার ভাষ্যকার উবট্ ও চক্রাঙ্গাকে হিলমোচিকা ব'লেছেন।

যাস্কের ব্যাখ্যায় দেখা যায় হিল শব্দটি রতিকে, মৌল শক্তি বা ধাতু কে বোঝায় এবং সেটিকে মোচিকা অর্থাৎ যে মুক্ত করে সেইটি হিলমোচিকা অর্থাৎ মালিন্যকে দূর করে। এখানে জলজ এই ভেষজ লতাটি হিলমোচিকা। অন্যত্র এই হিলমোচিকা শব্দটির প্রয়োগও হ'তে পারে, তবে এখানে এটি একটি ভেষজ।

উবট্ ব'লেছেন, এই ভেষজটিকে ঋষি ব'লেছেন তুমি আমাদের দ্বারা অবসৃষ্টা হ'য়ে জীবশোণিতের যে শত্রু, তার মধ্যে প্রবেশ কর, তাকে ভেদ কর।

বৈদ্যকের নথি
(নাম ও ভাষ্যের অনুশীলন)

(১) এই নামকরণ এবং তার তাৎপর্য বিচার ক'রে মনীষীগণ যেটি নিরূপণ ক'রেছেন সেইটাই ব্রহ্মোক্তি নামে বর্ণিত করা; এতে ইঙ্গিতই বহন ক'রে, আজ আমাদের হিলমোচিকা নামটিও সেই রকম। এই নামটি তার গুণবাচী অর্থাৎ সে জীবশোণিতের ঔজ্জ্বল্যনাশক দোষকে নষ্ট কওে, তাই সে হিলমোচিকা–এই শব্দটি সার্বজনিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'লেও তার বিশেষ শক্তি এইটাই ব'লে এই নামে তার প্রসিদ্ধি।

(২) তুমি বিষঘ্নী–এটিও তার গুণবাচক প্রতিধ্বনি।

(৩) তুমি অবসৃষ্টা হয়ে শত্রুর শরীরে প্রবেশ কর, এখানে শরীরের মলাংশকে ভেদ করাই ধ্বনিত হয়েছে।

(৪) চক্রাঙ্গী–এখানে চক্র শব্দের অর্থ ঔজ্জ্বল্যকারক, তাই সে চক্রাঙ্গী।

(৫) আর একটা কথা–নৈষধের চক্রাঙ্গ শব্দটির অর্থ দীপ্তিকর এবং ভাষ্যকর সে অর্থটিকে আরও পরিস্ফুট ক'রেছেন হিলমোচিকার নামে। দেহের রতি বা কান্তি যদি নিষ্প্রভ হয়ে যায়, তার সঙ্গে আরও আনুষঙ্গিক কারণ থেকে যায়–সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের কর্তব্য, যে ভেষজের দ্বারা তার মালিন্য দূর করা যায়।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, দেহের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য কার দ্বারা সৃষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে চরক-সুশ্রুতের বক্তব্য–আমাদের ত্রিধাতু (বায়ু, পিত্ত ও কফ) বিজ্ঞানের অন্যতম মৌল পদার্থ পিত্ত, এই ধাতুটি স্বভাবে থাকলেই দেহের ঔজ্জ্বল্য থাকে, আর বিকৃত হ'লেই মলিনতা সৃষ্টি করে।

কথাটা খুলে বলি–পিত্ত উষ্ণগুণসম্পন্ন দ্রব্য, তীক্ষ্ণধর্মী, দ্রব্য

অম্ল এবং কটু, এটি স্বভাবে থাকলেই অগ্নিবল ক্লেশসহিষ্ণুতা, পরাক্রমশালিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকার লাভ করা, আর দেহটি হয় ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী, এটি বিকৃত হ'লেই বিপরীত। এই বিকারের একটা বিশেষ আগন্তুক উপসর্গ হ'লো রক্তকণিকার স্বল্পতা বা হ্রাস ও শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি।

এক্ষেত্রে যে ভেষজে তিক্তরসের প্রাধান্য এবং কষায় রস তার অনুষঙ্গী থাকে, সেই ভেষজ এক্ষেত্রে উপযোগী, তাই হিলমোচিকার (হিঞ্চের) ব্যবহার। সংক্ষেপে এইটাই সিদ্ধান্ত যে, যেখানে কফ এবং পিত্তদোষে রোগ সৃষ্টি হবে সেখানেই হিলমোচিকা কার্যকরী হবে, সে যে রোগই হোক। তাই বৈদ্যক সম্প্রদায় এই ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবহার ক'রে আসছেন।

প্রথমেই এই ভেষজটির পরিচিতি সম্পর্কে একটু জানিয়ে রাখি– এটি জলজ শাক। আসাম, উড়িষ্যা, বিহারে জন্মালেও বাংলাদেশের যত্রতত্র বিলে, খালে ও পুকুরে জন্মে এবং জলের সন্নিকটস্থ কিনারায় হতে দেখা যায়, তবে লবণাক্ত জলে হয় না ; বাংলায় এটি সহজপ্রাপ্য। শাকটি স্বাদে তিক্ত কষায়, এর চলতি নাম হিঞ্চে বা হেলেঞ্চা, উড়িষ্যার অঞ্চলবিশেষে একে বলে হিড়ুমিচি। হিন্দিতে বলে হুরহুল্। এটির বোটানিক্যাল্ নাম Enhydra fluctuance Lour., d¨vwgwj Compositae.

লোকায়তিক ব্যবহার

১। শরীরের ভারবোধে ঃ– আপনি রোগা না মোটা সে কথা নয়, যেন নিজের শরীরটা নিজের নয়। এই ক্ষেত্রে হিঞ্চে শাকের রস ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হয়, এর দ্বারা এই অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

২। খোস চুলকানিতে ঃ– যাঁদের বর্ষা বা শীতে এই উপসর্গটি জোটে, তাঁরা ২/৩ চা-চামচ হিঞ্চের রস একটু গরম করে সকালের দিকে খাবেন, এটা থেকে রেহাই পাবেন।

৩। অপরিপাক দাস্তে ঃ–যাকে বলা হয় 'ভস্কা' এরূপ মল, তার সঙ্গে উৎকট গন্ধ থাকলে সেক্ষেত্রে হিঞ্চের রস ১ চা-চামচ গরম ক'রে সকালে অথবা বৈকালে খাওয়া ভাল। বালকদের ক্ষেত্রে ৩০ ফোঁটা। এর দ্বারা ঐ দোষটা চলে যাবে।

৪। অকারণে অগ্নিমান্দ্য ঃ- হ্যাঁ, কারণ না থাকলে তো হবে না, কিন্তু, কারণটা ধরা প'ড়ছে না, সেটা হ'লো বিকৃত শ্লেষ্মার ছোঁয়াচ তাতে থাকবেই, যার জন্যে পিত্ত সেখানে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না অথবা করে না। এ অসুবিধেটা দূর ক'রতে পারে হিঞ্চের রস, খেতে হবে ১ চা-চামচ একটু গরম ক'রে।

৫। বিস্বাদে ঃ– জিভে একটা সর পড়ে আছে, মুখে কিছু ভালো লাগে না, সবেতেই অরুচি, এক্ষেত্রে ২ চা-চামচ হিঞ্চের রস গরম ক'রে কয়েক দিন খেলেই ঐ অসুবিধেটা চলে যাবে।

৬। বাতের ভীতিতে ঃ– বাত হওয়ার তো কথা নয় কিন্তু কোমরের নিচের অংশটা আড়ষ্ট, ব্যথা এবং কোন কোন সময় রাত্রের দিকে পায়ের পেশীতে খিঁচে ধরা, এগুলি কিন্তু বিকৃত কফের ক্রিয়া ; এক্ষেত্রে হিঞ্চের রস ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে সকালের দিকে খেতে হবে।

৭। হাত-পা জ্বালায় ঃ–এর সঙ্গে মুখেও গরম ভাপ্ বেরোয়, চোখও জ্বালা ক'রছে (অবশ্য এটা বর্ষা এবং শরৎকালেই বেশী দেখা দেয়), একেত্রে ২ চা-চামচ রস গরম না ক'রে কাঁচা দুধ মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা ঐ অসুবিধেগুলি চলে যাবে।

৮। খোস পাচঁড় ঃ– সারছে না, এমন কি কোন জায়গায় ছড়ে গেলেই ঘা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সারতে চায় না, সে ক্ষেত্রে হিঞ্চের রস ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে দু'বার খেতে হয়।

৯। নিম্নাঙ্গের শোথে ঃ– দেখা যাচ্ছে কোমর ও পা দুটো রোজ ফুলে যায়, বিশ্রাম করলে কমে, এক্ষেত্রে কফাশ্রিত বায়ুই এর কারণ (অবশ্য হৃদ্‌রোগেও অনেক সময় পায়ে ফুলো দেখা যায়, সেক্ষেত্রে এটি ব্যবহার্য নয়)। উপরিউক্ত ক্ষেত্রে হিঞ্চের শাক বেটে পায়ে বা কোমরে প্রলেপ দিলে ওটা কমে যায়।

১০। ঘামাচিতে ঃ– দেশগাঁয়ে একটা কথা আছে–

শীতকালে জাড় কাঁটা গ্রীষ্মকালে ঘামাচি।
কোন্ কালে ছিলি রে তুই পরম রূপসী ॥

এই যে জাড়-কাঁটা অর্থাৎ শীতকালে ছোট-ছোট কাটার মত গায়ে একরকম চর্মরোগ হয়, তাকেই জাড়-কাঁটা বলে, 'জাড়' অর্থে শীত ; এক্ষেত্রেও ঘামাচিতে হিঞ্চে বেটে গায়ে মাখলে এ দুটি রোগ সেরে যায়।

এভিন্ন আমার অনেক অজানা তো রয়ে গেছে; এ অসমাপ্তি তো চিরকালই আছে ও থাকবেও, তাই উত্তরসাধকদের উদ্দেশ্যে বলে গেলাম।

এই হিঞ্চে সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতদূর আমার জানা আছে সেটা আপনাদের কাছে নিবেদন ক'রেছি, এখন একটা নতুন কথা মনে এসেছে–আমরা তো বেদ ভুলে হয়েছি বেদে, তাই ভানুমতীর বাচ্চা থলের ভিতর থেকে বার ক'রছি; আচ্ছা আপনি বলুন তো, রূপ যদি না থাকে, রূপক কল্পনা করা এটা কি কম গুণের কথা? তবে এটা আপনি ব'লতে পারেন, বেদে কি এই রকম উপাখ্যান সৃষ্টি করা হয়নি, এইসব ভেষজকে নিয়ে? হ্যাঁ, হ'য়েছে বৈকি, তবে সে এতটা হালকা কি ছিল? তাঁরা কি কোথাও স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করার পদ্ধতি দিয়ে গেছেন? মনে হয় তা দেন নি, তাই বৈদিক তথ্যের বাস্তবটাকে দর্পণে প্রতিফলিত করেছেন মাত্র, তাই আমরাও আজ পৌরাণিক তথ্যের আফিংখোর, ঘুমিওপ্যাথির ব্যবস্থা করে চলেছি। এই জলজ ভেষজ যে চক্রাঙ্গ (হিঞ্চে) পাঁকে (পঙ্কে) জন্মে আর জলে থাকে, সে যেন সানের পাথর। আমাদের শরীরের শ্রেষ্ঠধাতু যে শুক্র, এই চক্র তাকে সান্ দিয়ে উজ্জ্বল ক'রে দেয়, সেই জন্যেই তার নাম দেওয়া হয়েছে চক্রাঙ্গী?

যে ফুল শোভা না ছড়িয়ে ঝড়েছে ধরণীতে

শ্রীঅণির্বান দেবনাথ

আজ হঠাৎ-ই আমার মনখানি পালতোলা নৌকার মতন স্মৃতি-মন্থনে ব্যস্ত হয়েছিলো অজানা লক্ষ্যের দিকে । আশার আলোক দীপ্তির পরিস্ফুটনে কবিগুরুর গানের কলি মনে যোগাল স্মৃতির হাওয়া–

‘মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে সেদিন ভরা সাঁঝে,
যেতে যেতে দুয়ার হতে কী ভেবে ফিরালে মুখখানি ।’

আবার ভাবনার উদয়ে মন উর্দ্ধগগনে উঠলো । রমা কাকার চলে যাওয়া সারা জাগালো মনে । মানুষটাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি । “যে আগে ঝাপ দিয়েছে সেই নেতা ।” পরম দয়ালের এই অমৃতময় বেদবাণীর মোক্ষম প্রমাণ পেয়েছিলাম রমা কাকাকে দেখে। হিমাইতপুরে দয়ালের উৎসবকে সামনে রেখে সবাই যখন নিজ মনের একান্ত অনুরক্তি তব শ্রীচরণে ঢেলে দিয়ে উৎসব স্বার্থক করার লক্ষ্যে কাজ করত, নাওয়া খাওয়া ভুলে, তখন কিছু মানুষের নিস্পাপ ভাবের প্রাণোদ্দীপনা দেখতাম বেশ করে । দয়ালের বাণীর কষ্ঠিপাথরে ঘষে নিতাম তাদের । সেই সকল মানুষের মধ্যে রমা কাকা ছিলেন অন্যতম । সে রমা কাকা চলে যাওয়ার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষীও ছিলাম আমি । ঢাকায় আগাড়গাঁওয়ে নিউরো সায়েন্স ইনস্টিউটের বিশেষ ইউনিট আই. সি. ইউ.-এর ঠিক পাশেই পোস্ট অপারেটিভ ইউনিট । সদা চঞ্চল মানুষটি ভর্তি ওখানে । পাশেই কাকীমা, ঋতম, প্রভু-মামা সবাই আছেন । মাঝে মাঝেই করুণ কান্নার শব্দে ভারী হয়ে উঠছে আই. সি. ইউ.-এর পাশের পরিবেশ । সাথে আমাদেরও যেন পায়ের নিচের মাটি সরে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল । তখনও কাকীমা কিছুই জানেন না । কাকীমার সাথে তাই আমাদের অভিনয়ও চলছিলো সমান তালে । হঠাৎ আসলো সেই খবর । নার্স এসে খবর দিলো রমা কাকা আর নেই । ঋতম বসে কান্না শুরু করল । আমার মনে তখনও বিস্তর কালো অন্ধকার । রমা কাকার নিথর দেহ বের করতেই কাকীমা দৌড়ে আসলেন । কাকীমার কান্নায় আবারও ভারী হয়ে উঠল পোস্ট অপারেটিভ ইউনিটের আসে পাশের বাতাস ।

শুনেছি শাস্ত্রকারগণ বলে থাকেন আত্মা নিশ্চল, আর তাঁতে বাসনার উদয় হলেই চঞ্চল ভাব ধারণ করে তাকে মন বলে । এই মন বহু ভাবযুক্ত হয়ে বহু আকার ধারণ তাই সৃষ্টি । অর্থাৎ “একোহহং বহুস্যাম্” । সেদিক থেকে মানুষের মৃত্যু কী সম্ভব? যেখানে দয়াল ঠাকুর আমার বলে গেছেন “মৃত্যু একটি আরোগ্য জনক ব্যাধি” । বোধকরি এসব জন্য, মৃত্যু সেই তাঁকেই পাওয়ার আত্মিক সম্বন্ধ মাত্র । কি জানি, রমা কাকার চলে যাওয়ার করুণ স্মৃতি মনে পড়লে এখনো শুধু মনে হয়, যে ফুল নিজ শোভা দিয়ে সুশোভিত করে তুলতে পারত–পৃথিবী তৎসহ মানব হৃদয়কে । সে ফুল যেন আমাদের অহমিকায় আমরাই দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিলাম মাটিতে । আসলে এ যেন যে ফুল শোভা না ছড়িয়ে ঝড়েছে ধরণীতে...॥

একটুখানি চোখ রাখুন

ইষ্টপ্রাণ দাদা/মায়েরা, সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার লক্ষ্যে আপনার বার্ষিক বকেয়া গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করুন । সেই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করুন ।

-সম্পাদক

প্রার্থনার সময়সূচি

(বাংলাদেশ সময়ানুসারে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা সূর্যোদয়ের ৩০ মিনিট পূর্বে এবং সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা সূর্যাস্তের সাথে সাথে)

মাসের নাম	তারিখ / সময়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
জানুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫
	সন্ধ্যা	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭
ফেব্রুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.১৯	৬.১৮	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৫
	সন্ধ্যা	৫.৪৯	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৭
মার্চ	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১
	সন্ধ্যা	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১১
এপ্রিল	প্রাতঃ	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৩	৫.২২	৫.২১	৫.২১
	সন্ধ্যা	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩
মে	প্রাতঃ	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৭	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৫	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৩	৫.০৩	৫.০২	৫.০২	৫.০১	৫.০০	৫.০০
	সন্ধ্যা	৬.২৯	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩২	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩৪	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৫	৬.৩৬
জুন	প্রাতঃ	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪
	সন্ধ্যা	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৭	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৪৯
জুলাই	প্রাতঃ	৪.৫৭	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৯	৪.৫৯	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০১	৫.০১	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০৩
	সন্ধ্যা	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২
অগাস্ট	প্রাতঃ	৫.০৯	৫.১০	৫.১০	৫.১১	৫.১১	৫.১২	৫.১২	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৫	৫.১৫
	সন্ধ্যা	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪৩	৬.৪২	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪০	৬.৩৯	৬.৩৯	৬.৩৮	৬.৩৭
সেপ্টেম্বর	প্রাতঃ	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫
	সন্ধ্যা	৬.২৩	৬.২২	৬.২১	৬.২০	৬.১৯	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১০	৬.০৯
অক্টোবর	প্রাতঃ	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৬
	সন্ধ্যা	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯
নভেম্বর	প্রাতঃ	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩
	সন্ধ্যা	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৩	৫.২৩	৫.২২	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.২০	৫.১৯	৫.১৯
ডিসেম্বর	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩
	সন্ধ্যা	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯

মাসের নাম	তারিখ / সময়	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
জানুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮
ফেব্রুয়ারি	প্রাতঃ	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৫			
	সন্ধ্যা	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৪	৬.০৪			
মার্চ	প্রাতঃ	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫
	সন্ধ্যা	৬.১১	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৭
এপ্রিল	প্রাতঃ	৫.২০	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৪	৫.১৩	৫.১২	৫.১২	৫.১১	৫.১০	৫.১০	৫.০৯	
	সন্ধ্যা	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৬	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৯	
মে	প্রাতঃ	৪.৫৯	৪.৫৯	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৭	৪.৫৭	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫
	সন্ধ্যা	৬.৩৬	৬.৩৭	৬.৩৭	৬.৩৮	৬.৩৮	৬.৩৯	৬.৪০	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৩
জুন	প্রাতঃ	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৭	৪.৫৭	
	সন্ধ্যা	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	
জুলাই	প্রাতঃ	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৭	৫.০৭	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৯
	সন্ধ্যা	৬.৫২	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৮	৬.৪৭	৬.৪৭
অগাস্ট	প্রাতঃ	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০
	সন্ধ্যা	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৫	৬.৩৪	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩২	৬.৩১	৬.৩০	৬.৩০	৬.২৯	৬.২৮	৬.২৭	৬.২৬	৬.২৫	৬.২৪
সেপ্টেম্বর	প্রাতঃ	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩০	
	সন্ধ্যা	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৫	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	
অক্টোবর	প্রাতঃ	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৩	৫.৪৪
	সন্ধ্যা	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৭
নভেম্বর	প্রাতঃ	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০১	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৩	
	সন্ধ্যা	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	
ডিসেম্বর	প্রাতঃ	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭

প্রস্তুতকারক ঃ শ্রীঅসিতকুমার মণ্ডল (সহ-প্রতিঋত্বিক), সহযোগিতায় ঃ শ্রীঅরবিন্দকুমার মণ্ডল (যাজক), সাতক্ষীরা।